Through Knowledge towards Jannah

Islamic Online Madrasah – IOM

ব্যাচেলর ইন দাওয়াহ এন্ড ইসলামিক স্টাডিজ

রিসার্চের বিষয়ঃ

রোযার গুরুত্ব ও ফযীলত

তত্ত্বাবধায়নেঃ

মাও: জিল্লুর রহমান

রিসার্চ ডিপার্টমেন্ট।

ইসলামিক অনলাইন মাদ্রাসা – আইওএম

জমা দিয়েছেনঃ

আরিফা আক্তার

রোলঃ 216022198

৩০ মে,২০২৪ ইং

Through Knowledge towards Jannah

Islamic Online Madrasah – IOM

ব্যাচেলর ইন দাওয়াহ এন্ড ইসলামিক স্টাডিজ

রিসার্চের বিষয়ঃ

রোযার গুরুত্ব ও ফযীলত

এই রিপোর্ট টি ইসলামিক অনলাইন মাদ্রাসার ব্যাচেলর ইন দাওয়াহ এন্ড ইসলামিক স্টাডিজের একটি আনুসাঙ্গিক রিপোর্ট।

তত্ত্বাবধায়নেঃ

মাওঃ জিল্লুর রহমান

রিসার্চ ডিপার্টমেন্ট।

ইসলামিক অনলাইন মাদ্রাসা – আইওএম

জমা দিয়েছেনঃ

আরিফা আক্তার

রোলঃ 216022198

Through Knowledge towards Jannah

Islamic Online Madrasah – IOM

ব্যাচেলর ইন দাওয়াহ এন্ড ইসলামিক স্টাডিজ

প্রত্যয়ন পত্র

এই মর্মে প্রত্যয়ন করা যাচ্ছে যে, "রোযার গুরুত্ব ও ফযীলত" বিষয়ক গবেষণাপত্র টি আমার তত্ত্বাবধানে ব্যাচেলর ইন দাওয়াহ এন্ড ইসলামিক স্টাডিজ ডিপার্টমেন্ট থেকে আরিফা আক্তার, আইডিঃ 216022198 বিচক্ষনতার সাথে সম্পন্ন করেছেন।

(স্বাক্ষর)

____

তত্ত্বাবধায়নেঃ

মাও: জিল্লুর রহমান

রিসার্চ ডিপার্টমেন্ট।

ইসলামিক অনলাইন মাদ্রাসা – আইওএম

(স্বাক্ষর)

____

এক্সটারনালঃ

নাম:

ডিপার্টমেন্ট:

প্রতিষ্ঠান:

ঘোষণাপত্র

আমি নিম্নস্বাক্ষরকারী এ মর্মে ঘোষণা করছি যে, "রোযার গুরুত্ব ও ফযীলত" শিরোনামে এই গবেষণাপত্র ইসলামিক অনলাইন মাদ্রাসার (Islamic Online Madrasah – IOM) ব্যাচেলর ইন দাওয়াহ এন্ড ইসলামিক স্টাডিজ বিভাগের "মাও: জিল্লুর রহমান" উস্তাদের প্রত্যক্ষ তত্ত্বাবধানে ও নির্দেশনায় সম্পন্ন করেছি। অন্য কোন বিশ্ববিদ্যালয় বা প্রতিষ্ঠানে কোন প্রকার ডিগ্রি/ডিপ্লোমা অর্জনের জন্য বা প্রকাশের জন্য গবেষণাপত্র সম্পূর্ণ কিংবা এর অংশবিশেষ উপস্থাপন করা হয়নি।

আমি আরও ঘোষণা করছি যে, এই গবেষণা কর্মটি আমার নিজস্ব মৌলিক রচনা। আমার জানা মতে ইতিপূর্বে আর কোন ব্যক্তি এই শিরোনামে কোন গবেষণাপত্র রচনা করেননি।

(স্বাক্ষর)

তারিখঃ

৩০ মে, ২০২৪ ইং

আরিফা আক্তার

আইডিঃ 216022198

ব্যাচেলর ইন দাওয়াহ এন্ড ইসলামিক স্টাডিজ।

ইসলামিক অনলাইন মাদ্রাসা।

সূচীপত্রঃ

ভূমিকা 7

রোজা/সাওমের সংজ্ঞা 9

রোজার প্রকারঃ 12

রোজা ফরয হওয়ার সময়কালঃ 13

রোজার উদ্দেশ্য 14

রোজা সম্পর্কিত কুরআনের আয়াতসমূহঃ 20

রোজা সম্পর্কিত হাদীসসমূহঃ 23

রোজার উপকারিতা...29

রোজা রাখার ফলে শারীরিক সুস্থতাঃ 33

তাকওয়া অর্জনে রোজার ভূমিকাঃ 35

রোযা 'রিয়া' মুক্ত ইবাদাত 37

কুরআন ও সহীহ হাদীসের আলোকে রোযার গুরুত্ব ও ফযীলতঃ 41

হাদীস শরীফে বর্ণিত রোযার কিছু ফযীলত ও বৈশিষ্ট্য এখানে উল্লেখ করা হলো : .45

ক্ষমা লাভের সুবর্ণ সুযোগ 61

কোরআন নাজিলের মহিমায় মহিমান্বিত মাস রমজান...64

রোজা রাখার ১৫টি ফজিলতঃ...70

রোজা রাখার সওয়াব এবং না রাখার শাস্তিঃ...72

রমজান মাসের গুরুত্বপূর্ণ ৩০ টি আমলঃ 79

রমজানের প্রথম রাতে আসমানে যে ঘোষণা দেওয়া হয়ঃ 93

রমজান মাস ধৈর্যের মাসঃ...95

রোজার প্রতিদানঃ..97
রোজার গুরুত্বঃ 104
রোজার বিধান...108
মহিমান্বিত রাত লাইলাতুল কদর 120
এতেকাফ...128
এতেকাফের সংজ্ঞাঃ 128
এতেকাফের ফজিলতঃ..134
এতেকাফের উপকারিতাঃ...137
এতেকাফের আহকামঃ...139
এতেকাফের উদ্দেশ্যঃ..139
এতেকাফের বিধানাবলিঃ...142
মসজিদ থেকে বের হওয়ার বিধানঃ...144
এতেকাফকারীর জন্য যা কিছু বিধিবদ্ধঃ 145
এতেকাফকারীর জন্য যা অনুমোদিতঃ..146
এতেকাফকারী যা থেকে বিরত থাকবেঃ..147
রোজার ভূমিকা, তাৎপর্য ও ইতিহাসঃ...148

ভূমিকা

পরম করুণাময় রাব্বুল আলামীন আল্লাহ তায়ালা এমন কোন বিধান মানুষের উপর চাপিয়ে দেননি যা মানুষের সাধ্যের বাহিরে। মানুষের উপযোগী করেই ইসলামের প্রতিটি বিধান তৈরী করা হয়েছে।যা পালন করা তেমন কষ্টকর বিষয় নয়। মহব্বত ও আন্তরিকতা থাকলেই অনায়াসে সমস্থ আদেশ পালন করা যায়। স্থান, কাল ও পাত্র ভেদে আল্লাহপাক ইসলামের বিধান পরিবর্তন পরিবর্ধন,সংযোজন বিয়োজন করে ইসলামকে সময়োপযোগী পূর্ণাঙ্গ জীবন বিধান হিসেবে মনোনীত করেছেন।

ইসলাম ধর্মের পাঁচটি মূল ভিত্তির তৃতীয়টি হলো রোজা। ইসলামি বিধান অনুসারে মুসলিম, প্রাপ্তবয়স্ক,সুস্থ মস্তিষ্কসম্পন্ন,স্থায়ী ও শারীরিক মানসিকভাবে সামর্থ্যবান প্রত্যেক মুসলিমের জন্য সিয়াম পালন বা রোজা রাখা ফরজ।

রোজা বা সাওম হল সুবহে সাদিক থেকে সুর্যাস্ত পর্যন্ত সকল প্রকার পানাহার,পঞ্চ - ইন্দ্রিয়ের দ্বারা গুনাহের কাজ এবং (স্বামী-স্ত্রীর ক্ষেত্রে) যৌনসংগম থেকে বিরত থাকা। এ মাসে বিশ্বমুসলিমগণ অধিক ইবাদত করে থাকেন। কারণ অন্য মাসের তুলনায় এ মাসে ইবাদতের সওয়াব বহুগুণে বাড়িয়ে দেওয়া হয়।

এক বর্ণনায় এসেছে,

لِكُلِّ عَمَلٍ كَفَّارَةٌ، وَالصَّوْمُ لِي وَأَنَا أَجْزِي بِهِ

‘প্রত্যেক আমলেরই কাফফারা আছে। রোজা আমার জন্য, তাই আমি এর প্রতিদান দেব।’ (বুখারি ৭৫৩৮, মুসনাদে আহমাদ ১০৫৫৪)।

রোজা এমন এক আমল যার প্রতিদান মহান আল্লাহ তায়ালা দিবেন। এই হাদীসের মাধ্যমেই বুঝা যায় যে, রোজার গুরুত্ব ও ফযীলত অপরিসীম।

রোজাকে অন্য আমলের বর্ধিত সওয়াব থেকে আলাদা করা হয়েছে। অন্যান্য আমলের সওয়াব ১০ গুণ থেকে ৭০০ গুণ করার কথা বলা হলেও রোজার ব্যাপারটি আলাদা। কেননা এর সওয়াব সীমাবদ্ধ নয়; বরং আল্লাহ তাআলা রোজার সওয়াব বহু গুণে দান করবেন।

রোজার গুরুত্ব ও ফযীলত বর্ণনা করে শেষ করা সম্ভব নয়। তবুও কোরআন ও হাদীসের আলোকে কিছু গুরুত্ব ও ফযীলত তুলে ধরা হলো।

রোজা/সাওমের সংজ্ঞা

সাওমের আভিধানিক অর্থ :

সাওম (الصَّوْمُ) শব্দটি আরবী, একবচন, এর বহুবচন হলো (الصِّيَام) সাওম। সাওম পালনকারীকে 'সায়েম' বলা হয়। ফার্সিতে বলা হয় রোযা এবং রোযা পালনকারীকে বলা হয় রোযাদার। এর শাব্দিক অর্থ হলো, পানাহার ও নির্জনবাস থেকে বিরত থাকা।

অভিধানে শব্দটির অর্থ সম্পর্কে বলা হয়েছে,

الصَّوْمُ فِي اللُّغَةِ: الإمساكُ عَن الشيءِ والتَّرْكُ لَهُ. وَقيل للصائمِ صَائِم: لإمساكه عَن الْمطعم وَالْمشْرَب والمنكح.

"কোনো কিছু থেকে বিরত থাকা, সাওম পালনকারীকে 'সায়েম' বলা হয় এজন্য যে, সে খাদ্য, পানীয় ও জৈবিক চাহিদা থেকে বিরত থেকেছে।"

وَقيل للصامت: صَائِم، لإمساكه عَن الْكَلَام. وَقيل للفرسِ: صَائِم، لإمساكه عَن العَلَف مَعَ قِيَامه.

"চুপ থাকা ব্যক্তিকে 'সায়েম' বলা হয়, কেননা সে কথা বলা থেকে বিরত থেকেছে। এমনিভাবে যে ঘোড়া খাদ্য খাওয়া থেকে বিরত রয়েছে তাকেও 'সায়েম' বলা হয়।"

ইবন 'আরাবী রহ. বলেছেন,

وصامَ الرجلُ: إِذا تَظَلَّلَ بالصَّوْم، وَهُوَ شجر؛ قالهُ ابْن الْأَعرَابِي.

"কোনো ব্যক্তি যখন গাছের নিচে ছায়া নিচ্ছে তাকে বলা হয় 'সমার রজুল।" (লোকটি ছায়ায় থেকে চলাফেরা থেকে বিরত থেকেছে)।

লাইস রহ. বলেছেন,

الصَّوْمُ: تَرْكُ الْأكل وتَرْكُ الْكَلَام.

"সাওম হলো খাদ্য ও কথা বলা থেকে বিরত থাকা।" যেমন কুরআনে এসেছে,

﴿فَكُلِي وَٱشۡرَبِي وَقَرِّي عَيۡنٗاۖ فَإِمَّا تَرَيِنَّ مِنَ ٱلۡبَشَرِ أَحَدٗا فَقُولِيٓ إِنِّي نَذَرۡتُ لِلرَّحۡمَٰنِ صَوۡمٗا فَلَنۡ أُكَلِّمَ ٱلۡيَوۡمَ إِنسِيّٗا ٢٦﴾ [مريم: ٢٦]

"অতঃপর তুমি খাও, পান করো এবং চোখ জুড়াও। আর যদি তুমি কোনো লোককে দেখতে পাও তাহলে বলে দিও, 'আমি পরম করুণাময়ের জন্য চুপ থাকার মানত করেছি। অতএব, আজ আমি কোনো মানুষের সাথে কিছুতেই কথা বলব না।" [সূরা মারইয়াম, আয়াত: ২৬]।

وَصَامَ الفَرَس على آرِيِّه: إذا لم يَعْتَلِف. والصومُ: قِيَامٌ بِلَا عَمل. وصامَتِ الرِّيحُ: إذا رَكَدَت.

"ঘোড়া যখন খাদ্য খাওয়া থেকে বিরত থাকে তাকে বলা হয় 'সমাল ফারাস', আবার সাওম অর্থ কোনো কাজ না করা। বলা হয়, 'সমাতির রিহ' বাতাস যখন থেমে থাকে।"

সুফিয়ান ইবন 'উয়াইনাহ রহ. বলেছেন,

الصَّوْمُ هُو الصَّبْرُ، يَصْبِرُ الإنسانُ عَلَى الطَّعَامِ وَالشَّرَابِ وَالنِّكَاحِ، ثُمَّ قَرَأَ: إِنَّما يُوَفَّى الصَّابِرُونَ أَجْرَهُمْ بِغَيْرِ حِساب.

"সাওম অর্থ ধৈর্য। কেননা মানুষ খাদ্য, পানীয় ও স্ত্রী সহবাস থেকে ধৈর্য ধারণ করে।

অতঃপর তিনি এ আয়াতটি পড়েন,

﴿إِنَّمَا يُوَفَّى ٱلصَّٰبِرُونَ أَجۡرَهُم بِغَيۡرِ حِسَابٖ ١٠﴾ [الزمر: ١٠]

"কেবল ধৈর্যশীলদেরকেই তাদের প্রতিদান পূর্ণরূপে দেওয়া হবে কোনো হিসাব ছাড়াই"। [সূরা আয-যুমার, আয়াত: ১০]

সাওমের পারিভাষিক সংজ্ঞা :

আল-কামুসুল ফিকহি গ্রন্থে বলা হয়েছে,

الصوم هو إمساك عن المفطرات، حقيقة، أو حكما، في وقت مخصوص، من شخص مخصوص، مع النية.

وقيل: الصوم هو إمساك المكلف بالنية من الليل من تناول المطعم.

“সাওম হলো, নির্দিষ্ট সময় সুনির্দিষ্ট কার্যাবলী থেকে নিয়তসহ সাওম ভঙ্গকারী হাকীকী ও হুকমী (খাওয়া, পান করা এবং যৌনসম্ভোগ) বিষয় থেকে বিরত থাকা।”

কারও কারও মতে, ‘সাওম হচ্ছে মুকাল্লাফ তথা শরী’আতের নির্দেশনা প্রযোজ্য এমন লোকের পক্ষ থেকে নিয়তসহ রাত থেকে খাবার-পানীয় থেকে বিরত থাকা।

যুরযানী রহ. বলনে,

عبارة عن إمساك مخصوص وهو الإمساك عن الأكل والشرب والجماع من الصبح إلى المغرب مع النية.

“সুবহে সাদিক থেকে মাগরিব পর্যন্ত খাদ্য গ্রহণ এবং যৌনাচার থেকে নিয়তের সাথে বিরত থকার নাম হলো সাওম।”

বদরুদ্দীন ‘আইনী রহ. বলেন,

الصوم هو الإمساك عن المفطرات الثلاثة نهاراً مع النية.

“খাওয়া, পান করা এবং যৌনসম্ভোগ -এ তিনটি কাজ থেকে নিয়তসহ বিরত থাকার নাম হলো সাওম।” শরী’আতের দৃষ্টিতে সুবহে সাদিক থেকে সুর্যাস্ত পর্যন্ত পানাহার, যৌন সম্ভোগ ও শরী‘আত নির্ধারিত বিধি-নিষেধ থেকে নিয়তসহ বিরত থাকাকে সাওম বলে। শরী’আতে ঈমান, সালাত ও যাকাতের পরেই সাওমের স্থান। যা ইসলামের চতুর্থ রুকন।

রমযানের সিয়াম ফরয ও ইসলামের রুকন। এছাড়া যথাসম্ভব বেশি অতিরিক্ত বা নফল সিয়াম পালনে উৎসাহ দেওয়া হয়েছে। ফরয ও নফল সিয়ামের ফযীলতে রাসূলুল্লাহ বলেন, আল্লাহ বলেন:

كُل عَمَل ابْنِ آدَمَ لَهُ إِلا الصَّيَامَ فَإِنَّهُ لي وَأَنَا أَجْزِي بِهِ وَالصِّيَامُ جُنَّةٌ وَإِذَا كَانَ يَوْمُ صَوْمِ أَحَدِكُمْ فَلا يَرْفُثْ وَلا يَصْخَبْ فَإِنْ سَابَّهُ أَحَدٌ أَوْ قَاتَلَهُ فَلْيَقُلْ إِنِّي امْرُو صَائِمٌ وَالَّذِي نَفْسُ مُحَمَّدٍ بِيَدِهِ لَخُلُوفُ فَم الصَّائِمِ أَطْيَبُ عِنْدَ اللَّهِ مِنْ الْمِسْكِ لِلصَّائِمِ فَرْحَتَانِ يَفْرَحُهُمَا إِذَا أَفْطَرَ فَرِحَ وَإِذَا لَقِيَ رَبَّهُ فَرِحَ بِصَوْمِه

সিয়াম হলো ঢাল। তোমাদের কেউ যে দিনে সিয়াম পালন করবে সেই দিনে সে অশ্লীল বা বাজে কথা বলবে না ও চিল্লাচিল্লি, হৈচৈ বা ঝগড়াঝাটি করবে না। যদি কেউ তাকে গালি দেয় অথবা তার সাথে মারামারি করে তবে সে যেন বলে, আমি সিয়ামরত, আমি সিয়ামরত ।মুহাম্মাদের জীবন যাঁর হাতে তার শপথ, সিয়ামরত ব্যক্তির মুখের ক্ষুধা-জনিত গন্ধ আল্লাহর নিকট মেশকের সুগন্ধির চেয়েও প্রিয়)।

সিয়াম পালনকারীর জন্য দুইটি আনন্দ রয়েছে যখন সে আনন্দিত হয়: (১) যখন সে ইফতার করে তখন সে তার ইফতারীর জন্য আনন্দিত হয় এবং (২) যখন সে তার প্রতিপালকের সাথে সাক্ষাত করবে।

রোজার প্রকারঃ

রোজা মোট ছয় প্রকার ১. ফরজ রোজা, যেমন রমজান মাসের । ২. ওয়াজিব রোজা, যেমন মান্নতের রোজা । ৩. সুন্নত রোজা, যেমন, আশুরার রোজা ৪. মুস্তহাব রোজা, যেমন আইয়ামে বীযের রোজা প্রতি সপ্তাহে সোমবার ও বৃহস্পতিবার রোজা। রাখা। ৫. মাকরুহ রোজা, আশুরার **১**টি রোজা রাখা। ৬. হারাম রোজা, যেমন দুই ঈদের দিনে রোজা এবং কুরবানির ঈদের পরের তিন দিন রোজা রাখা।

রোজা ফরয হওয়ার সময়কালঃ

প্রথম কোন রোজা ফরজ ছিল এ নিয়ে মতভেদ রয়েছে। কেউ বলেন, ১০ মহররম অর্থাৎ আশুরায় রোজা ফরজ ছিল, আবার কারও কারও মতে, 'আইয়ামুল বিজ' অর্থাৎ প্রত্যেক চন্দ্র মাসে ১৩, ১৪ ও ১৫ তারিখে রোজা ফরয ছিল।

রাসূলুল্লাহ (সা.) যখন মদিনায় হিজরত করলেন তখন আইয়ামুল বিজের রোজা রাখতেন। হিজরতের দ্বিতীয় বর্ষে অর্থাৎ দ্বিতীয় হিজরিতে উম্মতে মুহাম্মদির জন্য রোজা ফরজ করা হয়। এ সময় এ আয়াত নাজিল হয় 'রমজান মাস, এ মাসেই নাজিল করা হয়েছে কোরআন মানুষের জন্য হেদায়েত, সৎপথের স্পষ্ট নিদর্শন এবং হক ও বাতিলের পার্থক্যকারী। অতএব তোমাদের মধ্যে যে ব্যক্তি এ মাস পাবে, সে যেন এ মাসে সিয়াম পালন করে। তবে কেউ রোগাক্রান্ত হলে অথবা সফরে থাকলে এ সংখ্যা অন্য সময় পূরণ করবে। আল্লাহ চান তোমাদের জন্য যা সহজ তা, আর তিনি চান না তোমাদের জন্য যা কষ্টকর তা, যেন তোমরা সংখ্যা পূর্ণ করো এবং আল্লাহর মহিমা ঘোষণা করো, তোমাদের সৎপথে পরিচালিত করার জন্য এবং যেন তোমরা শোকর করতে পার।' (সূরা বাকারা : ১৮৫)।

এ আয়াত নাজিলের পর আশুরার রোজা অথবা আইয়ামুল বিজের রোজা পালনের ফরজিয়াত মানসুখ হয়ে যায়। রাসূলুল্লাহ (সা.) মদিনায় হিজরত করার পর হিজরি দ্বিতীয় সনে রোজা ফরজ হওয়ার আগ পর্যন্ত দু'ধরনের রোজার প্রচলন ছিল। ক. আইয়ামুল বিজ অর্থাৎ প্রত্যেক চান্দ্র মাসের ১৩, ১৪ ও ১৫ তারিখে রোজা রাখা। খ. আশুরার দিন অর্থাৎ ১০ মহররমের দিন রোজা রাখা। বিখ্যাত সাহাবি হজরত আব্বাস (রা.) এর বর্ণনা থেকে জানা যায়, আগে রোজা ছিল এক সন্ধ্যা থেকে আরেক সন্ধ্যা পর্যন্ত। রাতে ঘুমানোর পরে পানাহার ও জৈবিক চাহিদা পূরণ করা বৈধ ছিল না।

হিজরি দ্বিতীয় সনে রোজা ফরজ হওয়ার পর থেকে উম্মতে মুহাম্মদি দীর্ঘ এক মাসব্যাপী রোজা পালন করে আসছে। পবিত্র রমজানের রোজার ক্ষেত্রে পাঁচটি পালনীয় দিক রয়েছে। ১. চাঁদ দেখে রোজা রাখা, ২. সকাল হওয়ার আগে রোজার জন্য নিয়ত করা, ৩. পানাহার ও জৈবিক বিশেষ করে যৌন চাহিদা পূরণ করা থেকে বিরত থাকা, ৪. ইচ্ছাকৃত বমি করা থেকে নিবৃত্ত থাকা ও ৫. রোজার পবিত্রতা রক্ষাকরা

রোজার উদ্দেশ্য

রোজা রাখার উদ্দেশ্য হলো, আল্লাহর সন্তুষ্টি লাভ করা, পাপ কাজ থেকে বিরত থাকা এবং নিজেদের কামনা-বাসনা নিয়ন্ত্রণের প্রশিক্ষণের মাধ্যমে পরহেজগারি বা তাকওয়া বৃদ্ধি করা।

ইসলামের ৫টি স্তম্ভের মধ্যে সিয়াম বা রোজা অন্যতম একটি স্তম্ভ।

হাদিসে কুদসীতে আল্লাহ তায়ালা রোজার প্রতিদান নিজ হাতে দেওয়ার ঘোষণা দিয়েছেন।

কোরআনে বলা হয়েছে,
পবিত্র কোরআনুল কারিমে মহান রাব্বুল আলামিন আল্লাহ তায়ালা ঘোষণা করেন,

সূরা বাকারহ আল্লাহ তা'য়ালা বলেন,
يَأَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُتِبَ عَلَيْكُمُ الصِّيَامُ كَمَا كُتِبَ عَلَى الَّذِينَ مِنْ قَبْلِكُمْ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُوْن.َ

হে মুমিনগণ, তোমাদের উপর সিয়াম ফরয করা হয়েছে, যেভাবে ফরয করা হয়েছিল তোমাদের পূর্ববর্তীদের উপর। যাতে তোমরা তাকওয়া অবলম্বন কর। (সূরা বাকারহ- আয়াতঃ ১৮৩)।

أَيَّامًا مَّعْدُودَةٍ فَمَنْ كَانَ مِنْكُمْ مَّرِيضًا أَوْ عَلَى سَفَرٍ فَعِدَّةٌ مِنْ أَيَّامٍ أُخَرَ وَعَلَى الَّذِينَ يُطِيقُونَهُ فِدْيَةٌ طَعَامُ مِسْكِينٍ فَمَنْ تَطَوَّعَ خَيْرًا فَهُوَ خَيْرٌ لَهُ وَأَنْ تَصُوْمُوا خَيْرٌ لَكُمْ إِنْ كُنْتُمْ تَعْلَمُون.َ

নির্দিষ্ট কয়েক দিন। তবে তোমাদের মধ্যে যে অসুস্থ হবে, কিংবা সফরে থাকবে, তাহলে অন্যান্য দিনে সংখ্যা পূরণ করে নেবে। আর যাদের জন্য তা কষ্টকর হবে, তাদের কর্তব্য ফিদয়া- একজন দরিদ্রকে খাবার প্রদান করা। অতএব যে স্বেচ্ছায় অতিরিক্ত সৎকাজ করবে, তা তার জন্য কল্যাণকর হবে। আর সিয়াম পালন তোমাদের জন্য কল্যাণকর, যদি তোমরা জান। (সূরা বাকারহ- আয়াতঃ ১৮৪)।

شَهْرُ رَمَضَانَ الَّذِي أُنْزِلَ فِيْهِ الْقُرْآنُ هُدًى لِلنَّاسِ وَبَيِّنَتٍ مِنَ الْهُدَى وَالْفُرْقَانِ فَمَنْ شَهِدَ مِنْكُمُ الشَّهْرَ فَلْيَصُمْهُ وَ مَنْ كَانَ مَرِيضًا أَوْ عَلَى سَفَرٍ فَعِدَّةٌ مِنْ أَيَّامٍ أُخَرَ يُرِيدُ اللَّهُ بِكُمُ ز الْيُسْرَ وَلَا يُرِيدُ بِكُمُ الْعُسْرَ وَلِتُكْمِلُوا الْعِدَّةَ وَلِتُكَبِّرُوا اللَّهَ عَلَى مَا هَدَيكُمْ وَلَعَلَّكُمْ تَشْكُرُون.َ

রমযান মাস, যাতে কুরআন নাযিল করা হয়েছে মানুষের জন্য হিদায়াতস্বরূপ এবং হিদায়াতের সুস্পষ্ট নিদর্শনাবলী ও সত্য-মিথ্যার পার্থক্যকারীরূপে। সুতরাং তোমাদের মধ্যে যে মাসটিতে উপস্থিত হবে, সে যেন তাতে সিয়াম পালন করে। আর যে অসুস্থ হবে অথবা সফরে থাকবে তবে অন্যান্য দিবসে সংখ্যা পূরণ করে নেবে। আল্লাহ তোমাদের সহজ চান এবং কঠিন চান না। আর যাতে তোমরা সংখ্যা পূরণ কর এবং তিনি তোমাদেরকে যে হিদায়াত দিয়েছেন, তার জন্য আল্লাহর বড়ত্ব ঘোষণা কর এবং যাতে তোমরা শোকর কর।

(সূরা বাকারহ- আয়াতঃ ১৮৫)।

وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ أُجِيبُ دَعْوَةَ الدَّاعِ إِذَا لا دَعَانِ فَلْيَسْتَجِيبُوا لِي وَلْيُؤْمِنُوا بِي لَعَلَّهُمْ يَرْشُدُون.َ

আর যখন আমার বান্দাগণ তোমাকে আমার সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করবে, আমি তো নিশ্চয় নিকটবর্তী। আমি আহবানকারীর ডাকে সাড়া দেই যখন সে আমাকে ডাকে।

সুতরাং তারা যেন আমার ডাকে সাড়া দেয় এবং আমার প্রতি ঈমান আনে। আশা করা যায় তারা সঠিক পথে চলবে।

(সূরা বাকারহ- আয়াতঃ ১৮৬)।

أُحِلَّ لَكُمْ لَيْلَةَ الصِّيَامِ الرَّفَثُ إِلَى نِسَائِكُمْ هُنَّ لِبَاسٌ لَكُمْ وَ أَنْتُمْ لِبَاسٌ لَهُنَّ عَلِمَ اللَّهُ أَنَّكُمْ كُنْتُمْ تَخْتَانُونَ أَنْفُسَكُمْ فَتَابَ ج عَلَيْكُمْ وَعَفَا عَنْكُمْ فَالْئُنَ بَاشِرُوهُنَّ وَابْتَغُوْا مَا كَتَبَ اللَّهُ لَكُمْ وَكُلُوا وَاشْرَبُوا حَتَّى يَتَبَيَّنَ لَكُمُ الْخَيْطُ الْأَبْيَضُ مِنَ ج الْخَيْطِ الْأَسْوَدِ مِنَ الْفَجْرِ ثُمَّ أَتِمُّوا الصِّيَامَ إِلَى الَّيْلِ وَلَا تُبَاشِرُوهُنَّ وَأَنْتُمْ عَلِفُوْنَ فِي الْمَسْجِدِ تِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ فَلَا تَقْرَبُوهَا كَذَلِكَ يُبَيِّنُ اللَّهُ أَيَتِهِ لِلنَّاسِ لَعَلَّهُمْ يَتَّقُوْن.َ

সিয়ামের রাতে তোমাদের জন্য তোমাদের স্ত্রীদের নিকট গমন হালাল করা হয়েছে। তারা তোমাদের জন্য পরিচ্ছদ এবং তোমরা তাদের জন্য পরিচ্ছদ। আল্লাহ জেনেছেন যে, তোমরা নিজদের সাথে খিয়ানত করছিলে। অতঃপর তিনি তোমাদের তাওবা কবুল করেছেন এবং তোমাদেরকে ক্ষমা করেছেন। অতএব, এখন তোমরা তাদের সাথে মিলিত হও এবং আল্লাহ তোমাদের জন্য যা লিখে দিয়েছেন, তা অনুসন্ধান কর। আর আহার কর ও পান কর যতক্ষণ না ফজরের সাদা রেখা কাল রেখা থেকে স্পষ্ট হয়। অতঃপর রাত পর্যন্ত সিয়াম পূর্ণ কর। আর তোমরা মাসজিদে ইতিকাফরত অবস্থায় স্ত্রীদের সাথে মিলিত হয়ো না। এটা আল্লাহর সীমারেখা, সুতরাং তোমরা তার নিকটবর্তী হয়ো না। এভাবেই আল্লাহ তাঁর আয়াতসমূহ মানুষের জন্য স্পষ্ট করেন যাতে তারা তাকওয়া অবলম্বন করে।(সূরা বাকারহ- আয়াতঃ ১৮৬)।

আল্লাহ তায়ালা যতসব ইবাদত তাঁর মু'মিন বান্দাদের ওপর ফরজ করেছেন, এর পেছনে কোনো না কোনো উদ্দেশ্য নিহিত রয়েছে। এ হিসেবে মু'মিনদের ওপর রোজা ফরজ করার পেছনেও রয়েছে আল্লাহর মহান উদ্দেশ্য।

১. **তাকওয়ার গুণে গুণান্বিত করা** : রোজার প্রধান উদ্দেশ্য মু'মিনদেরকে তাকওয়া তথা আল্লাহভীতির গুণে গুণান্বিত করা। আল্লাহ তায়ালা ইরশাদ করেন- 'হে ঈমানদাররা! তোমাদের ওপর রোজা ফরজ করা হয়েছে। যেরূপ ফরজ করা হয়েছিল তোমাদের পূর্ববর্তী লোকদের ওপর, যেন তোমরা তাকওয়া অর্জন করতে সক্ষম হও।' (সূরা আল বাকারা-১৮৩)। এ আয়াতে রোজা ফরজ করার উদ্দেশ্য বলা হয়েছে তাকওয়া অর্জন। তাকওয়া শব্দের আভিধানিক অর্থ সতর্ক হওয়া, ভয় করা, সংযত হওয়া, বেঁচে থাকা, শক্তি সঞ্চয় করা, দায়িত্বশীল হওয়া, জবাবদিহিতার দৃঢ় প্রত্যয় নিয়ে কর্তব্য সম্পাদন করা। পরিভাষায় তাকওয়া বলা হয় সতর্ক ও সচেতনতার সাথে পরকালে আল্লাহ তায়ালার কাছে জবাবদিহিতার মনোভাব নিয়ে নিষ্ঠা ও একাগ্রতার সাথে সব কাজ সম্পাদন করা এবং তাঁর সন্তুষ্টির পরিপন্থী সব কাজ বর্জন করা। তাকওয়ার বৈশিষ্ট্য হলো ছয়টি। যেমন- ১. সত্যের সন্ধান; ২. সত্য গ্রহণ; ৩. সত্যের ওপর অটল থাকা; ৪. আল্লাহভীতি; ৫. দায়িত্বানুভূতি; ৬. জবাবদিহিভিত্তিক দায়িত্বশীলতার সাথে কর্তব্য সম্পাদন।

২. **জৈবিক চাহিদা থেকে আত্মাকে মুক্ত রাখা :** জৈবিক চাহিদা মানবের সবচেয়ে ক্ষতিকর জিনিস। এর থেকে আত্মাকে মুক্ত রাখা রোজার অন্যতম উদ্দেশ্য। আল্লামা ইবনুল কাইয়্যিম সিয়াম সাধনার উদ্দেশ্য সম্পর্কে বলেন, সিয়ামের বিশেষ উদ্দেশ্য হচ্ছে মানুষকে তার পাশবিক বাসনা ও জৈবিক চাহিদা থেকে মুক্ত রাখা, সিয়াম সাধনার মাধ্যমে মানুষ আত্মশুদ্ধি ও পবিত্রতা অর্জন করে চিরন্তন জীবনের অনন্ত সফলতার শৈলচূড়ায় আরোহণ করে। পশুত্ব নিস্তেজ হয়ে মনুষ্যত্ব জাগ্রত হয়। সিয়াম দারিদ্র্যপীড়িত মানুষের প্রতি সহানুভূতির উদ্রেক সৃষ্টি করে মানুষের শারীরিক ও

আত্মিক শক্তির উন্নতি সাধন করে এবং পাশবিক চাহিদা যা মানুষের স্বাস্থ্যকে ধ্বংস করে তা থেকে মুক্ত করে। অনুরূপ রোজা কলবের ইসলাহ ও চরিত্র সংশোধনের ক্ষেত্রে কার্যকর ভূমিকা পালন করে থাকে (জাদুলমাআদ, প্রথম খণ্ড, পৃষ্ঠা-১৫২)। শাহ অলিউল্লাহ মুহাদ্দেসে দেহলবী রহ: হুজ্জাতুল্লাহিল বালিগাহ গ্রন্থে বলেছেন, রোজার উদ্দেশ্য হলো মানুষ থেকে পশু স্বভাব দূর করা। পশু স্বভাব মানুষের জন্য বিরাট ক্ষতিকর। তাই মহানবী সা: বলেছেন, 'যে ব্যক্তি অর্থাভাবে বিয়ে করতে অক্ষম সে যেন সিয়াম পালন করে। কারণ, সিয়াম পালনের ফলে শরীর দুর্বল হয়ে পড়বে এবং বিয়ে করার কামনা দূর হবে।' (মিশকাত বিয়ে পর্ব, পৃষ্ঠা- ২৬৭)।

৩. **আত্মিক ও দৈহিক ফায়দা :** দৈহিক উৎকর্ষ সাধনে রোজার ভূমিকা অন্যতম। সিয়াম সাধনায় যেমন আত্মিক পরিচ্ছন্নতা রয়েছে, তেমনি রয়েছে দৈহিক সুস্থতা। অধ্যক্ষ ডাক্তার বি সি গুপ্ত বলেছেন, ইসলাম সিয়াম সাধনার যে বৈজ্ঞানিক নির্দেশ দিয়েছে, তা যে মানুষের দৈহিক ও আত্মিক মঙ্গল সাধনে সক্ষম, এতে কোনো সন্দেহ নেই। ডাক্তার আর ক্যামবারড বলেছেন, সিয়াম পরিপক্ক শক্তির সহায়ক। ডক্টর এমারসন বলেন, যদি কারো স্বাস্থ্যের উন্নতির জন্য উপবাসের প্রয়োজন হয়, তবে সে যেন ইসলামের নির্দেশ অনুযায়ী রোজা পালন করে। অতএব এ কথা দিবালোকের মতো স্পষ্ট যে, সিয়াম সাধনায় অর্জিত হয় দৈহিক ও আধ্যাত্মিক উভয় প্রকার ফায়দা।

৪. **ধৈর্য ও সহানুভূতির শিক্ষা দান** : সিয়াম সাধনায় রয়েছে সিয়াম পালনকারীর জন্য ধৈর্য ও সহানুভূতির শিক্ষা। রোজা পালনের ফলে আত্মসংযম ও আত্মত্যাগের মহা পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হয়ে রোজাদারের দৈহিক, আত্মিক ও মানসিক অবস্থা পরিশুদ্ধ হয়। নিজে জঠরজ্বালা সহ্য করে এবং সমাজের গরিব-দুঃখী, ফকির-মিসকিন, যারা উপবাসে দিন কাটায়, তাদের অবস্থা অনুভব করে। তাই রমজান মাসকে বলা হয় ধৈর্য ও সহমর্মীর মাস।

৫. **রিপগুলো দমন করা :** সিয়াম সাধনা রিপুগুলো দমন করে এবং আত্মার লালসা দূরীভূত করে মু'মিনের দেহ ও মনে পরিচ্ছন্নতা আনয়ন করে। ফলে সিয়াম সাধনা আত্মশুদ্ধির অন্যতম সুযোগ। সিয়াম রিপুগুলো পুড়িয়ে ছাই করে দিয়ে মুত্তাকি হওয়ার পরম সুযোগ করে দেয়। সিয়াম সাধনা অনর্থক কাজ, মিথ্যা বচন, প্রবঞ্চনা, পরনিন্দা, অশ্লীলতা, অসৎকর্ম, কর্কশবাক্য ব্যবহার ইত্যাদি থেকে মুক্ত রাখে। মহানবী সা: বলেন, পাঁচটি জিনিসকে সিয়াম নষ্ট করে দেয়। তা হলো- মিথ্যা কথা, পরনিন্দা, কূটনামি, মিথ্যা শপথ ও কামভাবে দৃষ্টিপাত। মহানবী সা: বলেছেন, 'যে ব্যক্তি মিথ্যা কথা বলা ও মিথ্যা কাজ করা ছাড়তে পারল না, তার পানাহার ত্যাগ তথা রোজা রাখা আল্লাহর কোনোই প্রয়োজন নেই।' (বুখারি-১৭৭০)।

৬. **আল্লাহর গুণে গুণান্বিত করা** : সিয়াম সাধনা মানুষকে আল্লাহর গুণে গুণান্বিত করে। ইমাম গাজ্জালি রহ: 'ইয়াহইয়াউল উলুম' গ্রন্থে বলেছেন, আখলাকে ইলাহির গুণে মানুষকে গুণান্বিত করে তোলাই সিয়ামের অন্যতম উদ্দেশ্য। আল্লাহ তায়ালা পানাহার করেন না। রোজাদার পানাহার বর্জনের ফলে আখলাকে ইলাহির গুণে গুণান্বিত হয়।

৭. **ফেরেশতার গুণে গুণান্বিত করা** : সিয়াম সাধনার মাধ্যমে রোজাদার ফেরেশতার গুণে গুণান্বিত হয়। ফেরেশতারা যেমন পানাহার করে না, রোজাদারও পানাহার করে না। ফলে পানাহার ও কামাচার বর্জনের দিক দিয়ে ফেরেশতা ও রোজাদার সমগুণে গুণান্বিত হয়। রোজাদারদের মর্যাদা এই যে, তার মুখের গন্ধ আল্লাহ তায়ালার কাছে মৃগনাভির সুঘ্রাণের চেয়েও অধিক সুঘ্রাণ (মুসলিম-১৯৪৫)।

৮. **নফসকে বিবেকের শাসন মানতে বাধ্য করা** : মানবদেহের মূল অঙ্গ হলো নফস বা আত্মা। এই আত্মাকে নিয়ন্ত্রণ করা এবং মন্দ চিন্তা থেকে মুক্ত রাখার একমাত্র পন্থা হলো রোজা রাখা। নফস বা প্রবৃত্তিকে বিবেকের শাসন মানতে অভ্যস্ত করে তোলাই রোজার বিশেষ উদ্দেশ্য। প্রবৃত্তি ও বিবেক এই দুয়ের জয়-পরাজয় নিয়েই মানুষের

মধ্যে পশুত্ব ও সততার জয়-পরাজয় সূচিত হয়ে থাকে। আর সিয়াম পালনের মাধ্যমেই ব্যক্তি পশুত্বের ওপর সততা ও অন্যায়ের ওপর ন্যায় বিজয়ী হয়। অন্য কোনো ইবাদতে তা সম্ভব নয়।

৯. **পাপমুক্ত রাখা :** সিয়াম সাধনা নিজেকে পরিচ্ছন্ন রাখার শ্রেষ্ঠ মাধ্যম। হজরত জিবরাঈল আ: দোয়া করেছেন, আর মহানবী সা: আমিন বলেছেন, 'যে ব্যক্তি রমজান মাস পেল অথচ গুনাহগুলো মাফ করিয়ে নিতে পারল না, সে ধ্বংস হোক (আদারুল মুদরাবাদ, ইমাম বুখারি) এ দোয়া কখনো বিফলে যাবে না। এ মাসের প্রতিটি মুহূর্তে দোয়া কবুল হয়। বিশেষ করে ইফতারের সময়, শেষ রাতে, কদরের রাতে, জুমার দিনে। এ মাসের দানে ৭০০ গুণ সওয়াব পাওয়া যায়। একটি নফল আদায় করলে ফরজের সমান সওয়াব পাওয়া যায়। আল্লাহ তায়ালা নিজে সিয়াম পালনকারীর প্রতিদান দেবেন বলে ঘোষণা করেছেন। (মুসলিম-১৯৪৫) জান্নাতের একটি দরজার নাম রাইয়ান, যা দিয়ে শুধু রোজাদাররাই প্রবেশ করবেন। এ মাসের প্রথম ১০ দিন রহমতের, মধ্য ১০ দিন মাগফিরাতের এবং শেষ ১০ দিন নাজাতের। অতএব, সব দিক বিবেচনা করলে স্পষ্ট হয়, নিজেকে পাপমুক্ত রাখার এবং অধিক পুণ্য লাভের মুখ্য সময় হলো এ মাহে রমজান।

১০. **অনুপম ইবাদত :** রোজা একটি অনুপম ইবাদত। তা দীর্ঘ সময় ধরে পালন করতে হয়। এ মাসে কুরআনসহ সব আসমানি গ্রন্থ অবতীর্ণ হয়েছে, সব উম্মতের ওপর তা ফরজ এবং তা লৌকিকতামুক্ত ইবাদত।

রোজা সম্পর্কিত কুরআনের আয়াতসমূহঃ

রমযনের রোযা ইসলামের পাঁচ স্তম্ভের একটি। ঈমান, নামায ও যাকাতের পরই রোযার স্থান। রোযার আরবি শব্দ সওম, যার আভিধানিক অর্থ বিরত থাকা। পরিভাষায় সওম বলা হয়-প্রত্যেক সজ্ঞান, বালেগ মুসলমান নর-নারীর সুবহে সাদিক থেকে সূর্যাস্ত পর্যন্ত

রোযার নিয়তে পানাহার, স্ত্রী সহবাস ও রোযাভঙ্গকারী সকল কাজ থেকে বিরত থাকা। সুতরাং রমযান মাসের চাঁদ উদিত হলেই প্রত্যেক সুস্থ, মুকীম প্রাপ্তবয়স্ক পুরুষ এবং হায়েয-নেফাসমুক্ত প্রাপ্তবয়স্কা নারীর উপর পূর্ণ রমযান রোযা রাখা ফরয।তাই আমরা আজ রোজা সম্পর্কে কুরআনের আয়াত আরবি নিয়ে আলোচনা করবো।

এ সম্পর্কে আল্লাহ তাআলা ইরশাদ করেছেন-

يَٰٓاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا كُتِبَ عَلَيْكُمُ الصِّيَامُ كَمَا كُتِبَ عَلَى الَّذِيْنَ مِنْ قَبْلِكُمْ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُوْنَ ۝ اَيَّامًا
مَّعْدُوْدٰتٍ فَمَنْ كَانَ مِنْكُمْ مَّرِيْضًا اَوْ عَلٰى سَفَرٍ فَعِدَّةٌ مِّنْ اَيَّامٍ اُخَرَ وَعَلَى الَّذِيْنَ يُطِيْقُوْنَهٗ فِدْيَةٌ
طَعَامُ مِسْكِيْنٍ فَمَنْ تَطَوَّعَ خَيْرًا فَهُوَ خَيْرٌ لَّهٗ وَ اَنْ تَصُوْمُوْا خَيْرٌ لَّكُمْ اِنْ كُنْتُمْ تَعْلَمُوْنَ ۝ ‘

হে মুমিনগণ, তোমাদের উপর সিয়াম ফরয করা হয়েছে, যেভাবে ফরয করা হয়েছিল তোমাদের পূর্ববর্তীদের উপর। যাতে তোমরা তাকওয়া অবলম্বন করো। নির্দিষ্ট কয়েক দিন। তবে তোমাদের মধ্যে যে অসুস্থ, কিংবা সফরে থাকবে, তাহলে অন্যান্য দিনে সংখ্যা পূরণ করে নেবে। আর যাদের জন্য তা কষ্টকর হবে, তাদের কর্তব্য ফিদয়া- একজন দরিদ্রকে খাবার প্রদান করা। অতএব যে স্বেচ্ছায় অতিরিক্ত সৎকাজ করবে, তা তার জন্য কল্যাণকর হবে। আর সিয়াম পালন তোমাদের জন্য কল্যাণকর, যদি তোমরা জান। (সুরা বাকারা : ১৮৩-১৮৪)।

রোজা ইসলামের তৃতীয় ফরজ বিধান। আল্লাহ রমজান মাসজুড়ে রোজা পালনের নি দিয়েছেন। তবে রোজাদারের জন্য আল্লাহ তাআলা সুস্পষ্ট দিকনির্দেশনা দিয়েছেন; তাহলো- ‘দিনের বেলায় হালাল বস্তু খাওয়া ও পান করা থেকে বিরত থাকতে হবে। আবার স্বামী-স্ত্রীও মেলামেশা থেকেও বিরত থাকবে।’ এমনকি যারা রমজান মাসে

ইতেকাফকরবে; সেসব স্বামী-স্ত্রীও মেলামেশা করতে পারবে না। এসবই আল্লাহর নির্দেশ।

আল্লাহ তাআলা কোরআনে রমজান মাসে যেমন রোজা পালনের নির্দেশ দিয়েছেন তেমনি রোজায় করণীয় কী হবে তাও দিকনির্দেশনা দিয়েছেন। রোজার নির্দেশ দিয়ে মহান আল্লাহ ঘোষণা দেন-

شَهۡرُ رَمَضَانَ الَّذِیۡۤ اُنۡزِلَ فِیۡهِ الۡقُرۡاٰنُ هُدًی لِّلنَّاسِ وَ بَیِّنٰتٍ مِّنَ الۡهُدٰی وَ الۡفُرۡقَانِ فَمَنۡ شَهِدَ مِنۡکُمُ الشَّهۡرَ فَلۡیَصُمۡهُ وَ مَنۡ کَانَ مَرِیۡضًا اَو عَلٰی سَفَرٍ فَعِدَّۃٌ مِّنۡ اَیَّامٍ اُخَرَ یُرِیۡدُ اللّٰہ بِکُمُ الۡیُسۡرَ و لَا یُرِیۡدُ بِکُمُ الۡعُسۡرَ و لِتُکۡمِلُوا الۡعِدَّۃَ وَ لِتُکَبِّرُوا اللّٰہَ عَلٰی مَا هَدٰىکُمۡ وَ لَعَلَّکُمۡ تَشۡکُرُوۡنَ

রমযান মাস, যাতে কুরআন নাযিল করা হয়েছে মানুষের জন্য হিদায়াতস্বরূপ এবং হিদায়াতের সুস্পষ্ট নিদর্শনাবলী ও সত্য-মিথ্যার পার্থক্যকারীরূপে। সুতরাং তোমাদের মধ্যে যে মাসটিতে উপস্থিত হবে, সে যেন তাতে সিয়াম পালন করে। আর যে অসুস্থ হবে অথবা সফরে থাকবে তবে অন্যান্য দিবসে সংখ্যা পূরণ করে নেবে। আল্লাহ তোমাদের সহজ চান এবং কঠিন চান না। আর যাতে তোমরা সংখ্যা পূরণ কর এবং তিনি তোমাদেরকে যে হিদায়াত দিয়েছেন, তার জন্য আল্লাহর বড়ত্ব ঘোষণা কর এবং যাতে তোমরা শোকর কর। (সুরা বাকারা : আয়াত ১৮৫)।

রমজান মাস। এ মাস পেলেই মুমিন মুসলমানের জন্য রোজা রাখা আল্লাহর নির্ধারিত বিধান। কোরআনুল কারিমে তিনি এ ঘোষণাই দিয়েছেন- সুতরাং তোমাদের মধ্যে যে মাসটিতে উপস্থিত হবে, সে যেন তাতে সিয়াম পালন করে’।

আল্লাহ তাআলা কোরআনে আয়াত নাজিল করার মাধ্যমে সেই ফিদইয়া দেওয়ার বিধান রহিত করে দেন। রোজা পালনকে ঈমানদারদের জন্য আবশ্যক করে দেন।

এমনিভাবে কোনো কোনো সাহাবি গভীর রাতে ঘুম ভাঙার পরে স্ত্রীদের সঙ্গে সহবাসে লিপ্ত হয়ে, মানসিক কষ্টে পড়ে যান, তাই এই আয়াত নাজিল হয়। যাতে পুরাতন হুকুম বাধ দিয়ে নতুন করে-

أُحِلَّ لَكُمْ لَيْلَةَ الصِّيَامِ الرَّفَثُ اِلى نِسَآئِكُمْ هُنَّ لِبَاسٌ لَّكُمْ وَ اَنْتُمْ لِبَاس لَّهُنَّ عَلِمَ اللهُ اَنَّكُمْ كُنْتُمْ تَخْتَانُوْنَ اَنْفُسَكُمْ فَتَابَ عَلَيْكُمْ و عَفَا عَنْكُمْ فَالْئٰنَ بَاشِرُوْهُنَّ وَ ابْتَغُوْا مَا كَتَبَ اللهُ لَكُمْ وَ كُلُوا وَ اشْرَبُوا حَتّٰى يَتَبَيَّنَ لَكُمُ الْخَيْطُ الْاَبْيَضُ مِنَ الْخَيطِ الْاَسوَدِ مِنَ الفَجرِ ثُمَّ اَتِمُّوا الصِيَامَ اِلَى الَّيلِ و لَا تُبَاشِرُوْهُنَّ وَ اَنْتُمْ عٰكِفُوْنَ فِى الْمَسٰجِدِ تِلكَ حُدُودُ اللهِ فَلَا تَقرَبُوْهَا كَذٰلِكَ يُبَيِّنُ اللهُ ايتِه لِلنَّاسِ لَعَلَّهُمْ يَتَّقُونَ

রোজার রাতে তোমাদের স্ত্রীদের নিকট যাওয়া তোমাদের জন্য হালাল করা হয়েছে, তারা তোমাদের জন্য পোষাকসরূপ ও তোমরা তাদের জন্য পোষাকসরূপ। আল্লাহ জানে যে, তোমরা নিজদের সাথে অন্যায় করছিলে। এরপর তিনি তোমাদের তাওবা কবুল করেছেন, আর তোমাদেরকে ক্ষমা করে দিয়েছেন। সুতরাং, এখন তোমরা তাদের কাছে যাও আর আল্লাহ তোমাদের জন্য যা লিখে দিয়েছেন, তা অনুসন্ধান কর। আর তোমরা পানাহার করতে থাকো যতক্ষণ না ফজরের সাদা রেখা কালো রেখা থেকে স্পষ্ট হয়ে যায়। এরপর রাত হওয়া পর্যন্ত সিয়াম পূর্ণ করো। আর তোমরা মসজিদে ইতিকাফরত অবস্থায় স্ত্রীদের সাথে সহবাস করো না। এটা আল্লাহর সীমানা, সুতরাং তোমরা তার (স্ত্রীদের) নিকটবর্তী হয়ো না। এভাবেই আল্লাহ তাঁর আয়াতসমূহ মানুষের জন্য স্পষ্ট করেন যাতে তারা তাকওয়া অবলম্বন করে। (সুরা বাকারা : আয়াত ১৮৭)।

রোজা সম্পর্কিত হাদীসসমূহঃ

হিজরি সনের সেরা মাস রমজান। এ মাসের সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ ইবাদত রোজা। রোজা আল্লাহর অত্যন্ত প্রিয় ইবাদত। এর প্রতিদান তিনি নিজ হাতেই দেবেন। রোজার ফজিলত-মর্যাদা সম্পর্কে অসংখ্য হাদিস বর্ণিত হয়েছে। এ সম্পর্কিত কয়েকটি হাদিস তুলে ধরা হলোঃ

১। হজরত আবু হুরায়রা (রা.) বর্ণনা করেন, হাদিসে কুদসিতে রাসুলুল্লাহ (সা.) এরশাদ করেন, আল্লাহ তাআলা বলেন, ‘আদম সন্তানের প্রত্যেক আমল তার নিজের জন্য— রোজা ব্যতীত। কারণ, রোজা আমার জন্যই এবং আমি নিজেই তার প্রতিদান দেব।’ (মহানবী সা. আরও বলেন) ‘রোজা ঢাল স্বরূপ। তোমাদের কেউ যেন সিয়াম পালনের দিন অশ্লীলতায় লিপ্ত না হয় এবং ঝগড়া-বিবাদ না করে। যদি কেউ তাকে গালি দেয় অথবা তার সঙ্গে ঝগড়া করে, তাহলে সে যেন বলে, আমি একজন রোজাদার। যাঁর হাতে মুহাম্মদের প্রাণ তাঁর শপথ! অবশ্যই রোজাদারের মুখের গন্ধ আল্লাহর কাছে মেশকের সুগন্ধের চেয়েও সুগন্ধময়। রোজাদারের জন্য রয়েছে দুটি খুশির মুহূর্ত আছে, যা তাকে আনন্দিত করে। যখন সে ইফতার করে, সে খুশি হয় এবং যখন সে তার

পালনকর্তার সঙ্গে সাক্ষাৎ করবে, তখন রোজার বিনিময়ে আনন্দিত হবে।’ (বুখারি, হাদিস: ১৯০৪)।

২। হজরত হুজায়ফা (রা.) বলেন, আমি মহানবী (সা.)-কে বলতে শুনেছি, ‘মানুষের পরিবার, ধন-সম্পদ ও প্রতিবেশীর ব্যাপারে ঘটিত বিভিন্ন ফেতনা ও গুনাহর কাফফারা হলো নামাজ, রোজা ও সদকা।’ (বুখারি, হাদিস: ১৮৯৫)।

৩। হজরত সাহল ইবনে সাআদ (রা.) থেকে বর্ণিত, মহানবী (সা.) এরশাদ করেন, ‘জান্নাতের এক প্রবেশদ্বার রয়েছে, যার নাম রাইয়ান। কিয়ামতের দিন ওই প্রবেশদ্বার দিয়ে রোজাদারগণ প্রবেশ করবে। তারা ছাড়া আর কেউই ও দরজা দিয়ে প্রবেশ করবে না। বলা হবে, ‘কোথায় রোজাদারগণ?’ সুতরাং তারা ওই দরজা দিয়ে (জান্নাতে) প্রবেশ করবে। এর পর যখন তাদের সর্বশেষ ব্যক্তি প্রবেশ করবে, তখন সেই দরজা বন্ধ করা হবে। ফলে তা দিয়ে আর কেউই প্রবেশ করতে পারবে না।’ (বুখারি, হাদিস: ১৮৯৬)।

৪। হজরত আবু সাইদ (রা.) বর্ণনা করেন, রাসুলুল্লাহ (সা.) বলেন, 'যে বান্দা আল্লাহর পথে একদিন মাত্র রোজা রাখবে, সেই বান্দাকে আল্লাহ বিনিময়ে জাহান্নাম থেকে ৭০ বছরের পথ পরিমাণ দূরত্বে রাখবেন।' (বুখারি, হাদিস: ২৮৪০)।

৫। হজরত উসমান বিন আবুল আস থেকে বর্ণিত, মহানবী (সা.) এরশাদ করেন, 'রোজা জাহান্নাম থেকে বাঁচার জন্য ঢালস্বরূপ; যেমন যুদ্ধের সময় নিজেকে রক্ষা করার জন্য তোমাদের ঢাল থাকে।' (মুসনাদে আহমাদ, সহিহুল জামিউস সাগির, হাদিস: ৩৮৭৯)।

৬। হজরত আবদুল্লাহ ইবনে আমর (রা.) থেকে বর্ণিত, রাসুলুল্লাহ (সা.) এরশাদ করেন, 'কিয়ামতের দিন রোজা ও কোরআন বান্দার জন্য সুপারিশ করবে। রোজা বলবে, 'হে আমার প্রতিপালক, আমি তাকে পানাহার ও যৌনকর্ম থেকে বিরত রেখেছিলাম। সুতরাং তার ব্যাপারে আমার সুপারিশ গ্রহণ করুন।' কোরআন বলবে, 'আমি তাকে রাতের ঘুম থেকে বিরত রেখেছিলাম। সুতরাং তার ব্যাপারে আমার সুপারিশ গ্রহণ করুন।' মহানবী (সা.) আরও বলেন, 'অতএব উভয়ের সুপারিশ গৃহীত হবে।' (মুসনাদে আহমাদ, সহিহ তারগিব, হাদিস: ৯৬৯)।

৭। হজরত আবু উমামা (রা.) বর্ণনা করেন, আমি বললাম, 'হে আল্লাহর রাসুল, আমাকে এমন কোনো আমলের আজ্ঞা করুন; যার বিনিময়ে আল্লাহ আমাকে লাভবান করবেন।' (অন্য এক বর্ণনায় আছে, 'যার মাধ্যমে আমি জান্নাত যেতে পারব') তিনি বললেন, 'তুমি রোজা রাখো। কারণ, এর সমতুল্য কিছু নেই।' পুনরায় আমি বললাম, 'হে আল্লাহর রাসুল, আমাকে কোনো আমলের আদেশ করুন।' তিনি পুনরায় একই কথা বললেন, 'তুমি রোজা রাখো। কারণ, এর সমতুল্য কিছু নেই।' (নাসায়ি, সহিহ্ তারগিব, হাদিস: ৯৭৩)।

৮। হজরত হুজায়ফা (রা.) বর্ণনা করেন, মহানবী (সা.) আমার বুকে হেলান দিয়ে ছিলেন। তখন তিনি বললেন, 'লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ' বলার পর যে ব্যক্তির জীবনের পরিসমাপ্তি ঘটবে, সে জান্নাতে প্রবেশ করবে। আল্লাহর সন্তুষ্টি লাভের উদ্দেশ্যে একদিন

রোজা রাখার পর যে ব্যক্তির জীবনের পরিসমাপ্তি ঘটবে, সে জান্নাতে প্রবেশ করবে। আর আল্লাহর সন্তুষ্টি লাভের আশায় কিছু সদকা করার পর যে ব্যক্তির জীবনের পরিসমাপ্তি ঘটবে, সেও জান্নাত প্রবেশ করবে।’ (মুসনাদে আহমাদ, সহিহ্ তারগিব, হাদিস: ৯৭২)।

৯। হজরত আবদুল্লাহ ইবনু উমর রাদিয়াল্লাহু আনহু থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি রসুলুল্লাহ সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম -কে বলতে শুনেছি যে, তোমরা যখন চাঁদ দেখবে তখন সওম আরম্ভ করবে এবং যখন চাঁদ দেখবে তখন ইফতার করবে। তবে আকাশ মেঘাচ্ছন্ন থাকলে ত্রিশ রোযা পূর্ণ করবে। ইমাম ইসমাইল বুখারী (রঃ) উনার বিখ্যাত সহীহ বুখারীতে এই হাদিস শরীফটি উল্লেখ করেছেন।

১০। এছাড়াও ইসলামের ৫টি ভিত্তির মধ্যে ১টির অন্তর্ভুক্ত রোজা।

حَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللَّهِ بْنُ مُوسَى، قَالَ أَخْبَرَنَا حَنْظَلَةُ بْنُ أَبِي سُفْيَانَ، عَنْ عِكْرِمَةَ بْنِ خَالِدٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ ـ رضى الله عنهما ـ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم " بُنِيَ الإِسْلاَمُ عَلَى خَمْسٍ شَهَادَةِ أَنْ لاَ إِلَهَ إِلاَّ اللَّهُ وَأَنَّ مُحَمَّدًا رَسُولُ اللَّهِ، وَإِقَامِ الصَّلاَةِ، وَإِيتَاءِ الزَّكَاةِ، وَالْحَجِّ، وَصَوْمِ رَمَضَانَ

হজরত উবায়দুল্লাহ্ ইবনু মূসা (রাঃ) ইবনু উমর রাদিআল্লাহু আনহু থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেন, ইসলামের ভিত্তি পাঁচটি।

১।আল্লাহ্ ছাড়া ইলাহ্ নেই এবং নিশ্চয় মুহাম্মদ আল্লাহ্র রাসূল-এ কথার সাক্ষ্য দান।

২। সালাত (নামাজ) কায়েম করা

৩। যাকাত দেওয়া

৪। হাজ্জ (হজ্জ) করা এবং

৫। রামাদান এর সিয়াম পালন করা। (সহীহ বুখারি/ঈমান)

১১। হজরত তালহা ইবনু উবাদুল্লাহ রাদিয়াল্লাহু আনহু থেকে বর্নিত যে,

جَاءَ رَجُلٌ إِلَى رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم مِنْ أَهْلِ نَجْدٍ، ثَائِرُ الرَّأْسِ، يُسْمَعُ دَوِيُّ صَوْتِهِ، وَلاَ يُفْقَهُ مَا يَقُولُ حَتَّى دَنَا، فَإِذَا هُوَ يَسْأَلُ عَنِ الإِسْلاَمِ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ ـ صلى الله عليه وسلم " خَمْسُ صَلَوَاتٍ فِي الْيَوْمِ وَاللَّيْلَةِ ". فَقَالَ هَلْ عَلَىَّ غَيْرُهَا قَالَ " لاَ، إِلاَّ أَنْ تَطَوَّعَ ". قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم " وَصِيَامُ رَمَضَانَ ". قَالَ هَلْ عَلَىَّ غَيْرُهُ قَالَ " لاَ، إِلاَّ أَنْ تَطَوَّعَ ". قَالَ وَذَكَرَ لَهُ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم الزَّكَاةَ. قَالَ هَلْ عَلَىَّ غَيْرُهَا قَالَ " لاَ، إِلاَّ أَنْ تَطَوَّعَ ". قَالَ فَأَدْبَرَ الرَّجُلُ وَهُوَ يَقُولُ وَاللَّهِ لاَ أَزِيدُ عَلَى هَذَا وَلاَ أَنْقُصُ. قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم " أَفْلَحَ إِنْ صَدَقَ"

এলোমেলো চুলসহ একজন গ্রাম্য আরব রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম নিকট এলেন। তারপর বললেন, ইয়া রসুলুল্লাহ সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম! আমাকে বলুন, আল্লাহ তা'আলা আমার উপর কত সালাত ফরজ করেছেন? তিনি বলেনঃ পাঁচ (ওয়াক্ত) সালাত, তবে তুমি যদি কিছু নফল আদায় কর তা স্বতন্ত্র কথা। এরপর তিনি বললেন, বলুন, আমার উপর কত সিয়াম আল্লাহ তা'আলা ফরজ করেছেন? রাসূল (ﷺ) বললেনঃ রমযান মাসের সওম, তবে তুমি যদি কিছু নফল কর তবে তা স্বতন্ত্র কথা। এরপর তিনি বললেন, বলুন, আল্লাহ আমার উপর কি পরিমান যাকাত ফরয করেছেন? রাবী বলেন, রসুলুল্লাহ সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাঁকে ইসলামের বিধান জানিয়ে দিলেন। এরপর তিনি বললেন, ঐ সত্তার কসম, যিনি আপনাকে সত্য দিয়ে সম্মানিত করেছেন, আল্লাহ আমার উপর যা ফরয করেছেন, আমি এর মাঝে কিছু বাড়াব না এবং কমাবও না। রসূল সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেনঃ সেও সত্য বলে থাকলে সফলতা লাভ করল কিংবা বলেছেন, সে সত্য বলে থাকলে জান্নাত লাভ করল।ইমাম বুখারী (রঃ) উনার বিখ্যাত সহীহ বুখারীতে এই মুল্যবান হাদিস শরীফটি উল্লেখ করেছেন।

১২। হজরত আবূ হুরায়রা রাদিয়াল্লাহু আনহু থেকে বর্নিত, তিনি বলেন রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, রমযান আরম্ভ হলে রহমতের দরাজাসমুহ খুলে দেয়া হয়, জাহান্নামের দরজাসমুহ বন্ধ করে দেয়া হয় এবং শয়তানকে শিকলে আবদ্ধ করা হয়। (সহীহ মুসলিম)।

১৩। হজরত সাহল রাদিয়াল্লাহু আনহু থেকে বর্নিত,

রসূল সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেনঃ জান্নাতে রায়্যান নামক একটি দরজা আছে। এ দরজা দিয়ে কিয়ামতের দিন সওম পালনকারীরাই প্রবেশ করবে। তাঁদের ছাড়া আর কেউ এ দরজা দিয়ে প্রবেশ করতে পারবে না। ঘোষণা দেওয়া হবে, সাওম পালনকারীরা কোথায়? তখন তারা দাঁড়াবে। তাঁরা ছাড়া আর কেউ এ দরজা দিয়ে প্রবেশ করবে না। তাঁদের প্রবেশের পরই দরজা বন্ধ করে দেওয়া হবে। যাতে এ দরজা দিয়ে আর কেউ প্রবেশ না করে। (সহীহ বুখারি)।

১৪। হজরত আবূ হুরায়রা রাদিয়াল্লাহু আনহু থেকে বর্ণিত, রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, সিয়াম ঢাল স্বরূপ। সুতরাং অশ্লীলতা করবে না এবং মুর্খের মত কাজ করবে না। যদি কেউ তাঁর সাথে ঝগড়া করতে চায়, তাঁকে গালি দেয়, তবে সে যেন দুই বার বলে, আমি সাওম পালন করছি। ঐ সত্তার শপথ, যার হাতে আমার প্রানে, অবশ্যই সওম পালনকারীর মুখের গন্ধ আল্লাহর নিকট মিসকের গন্ধের চাইতেও উৎকৃষ্ট, সে আমার জন্য আহার,পান ও কামাচার পরিত্যাগ করে। সিয়াম আমারই জন্য। তাই এর পুরষ্কার আমি নিজেই দান করব। আর প্রত্যেক নেক কাজের বিনিময় দশ গুন।

ইমাম ইসমাইল বুখারী (রঃ)উনার বিখ্যাত সহীহ বুখারীতে এই মুল্যবান হাদিস শরীফটি উল্লেখ করেছেন।

রোজার উপকারিতা

রোজা রাখার উপকারিতাঃ

আল্লাহ তাআলা মুসলিম উম্মাহকে রোজা পালনের নির্দেশ দিয়ে বলেন, ‘হে ঈমানদারগণ! তোমাদের ওপর রোজা ফরজ করা হয়েছে, যেমনিভাবে তোমাদের আগের লোকদের ওপর ফরজ করা হয়েছিল। যাতে তোমরা তাকওয়া, পরহেজগারি অর্জন করতে পারো।’ (সুরা বাকারা : আয়াত ১৮৩)

অন্য আয়াতে আল্লাহ বলেন, ‘রমজান মাস, যে মাসে কুরআন নাজিল করা হয়েছে। যাতে রয়েছে মানুষের জন্য হেদায়েত। এ হেদায়েত সত্য মিথ্যা সুস্পষ্ট পার্থকারী। সুতরাং যারা এ মাসের সাক্ষাৎ পাবে তারা যেন রোজা পালন করে।’ (সুরা বাকারা : আয়াত ১৮৪)

রমজান মাসে রোজা পালন আল্লাহর তাআলা হুকুম। বিশেষ অক্ষমতা কিংবা অপারগতা ছাড়া রোজা ছেড়ে দিলে গুনাহ হবে। হাদিসে পাকে এসেছে-

‘বিশেষ কোনো ওজর ছাড়া যে ব্যক্তি রমজানের একটি রোজাও ভেঙে ফেলে, সে সারা জীবনও যদি রোজা রাখে তবুও রমজানের ওই রোজার হক আদায় হবে না। সে আল্লাহর সামনে এমনভাবে হাজির হবে যে, আল্লাহ চাইলে ক্ষমা করবেন বা শাস্তি দেবেন।’ (তাবারানি)

অন্য হাদিসে এসেছে, ‘যে ব্যক্তি কোনো কারণ ছাড়া রমজানের একদিন রোজা ভাঙে, সারা বছরেও তার কাজা হবে না হবে না, যদিও সে পুরো বছর রোজা পালন করে।’

(হাদিসটি বুখারির টিকায় উল্লেখ করা হয়েছে, আবু দাউদ, তিরিমজি, ইবনে মাজাহ, মুসনাদে আহমদ)

রোজার রাখার উপকারিতা

রমজানের রোজা পালনে রয়েছে অনেক উপকারিতা। হাদিসের নির্দেশনা এমন যে, ‘রোজা রাখুন, সুস্থ থাকুন।’

রোজাদার ব্যক্তির জন্য দিনের বেলায় পানাহার ও যৌন সম্ভোগ থেকে বিরত থাকতে হয়। যারা আল্লাহর এ নির্দেশ পালন করে তাদের জন্য রয়েছে বিশেষ সওয়াব ও প্রতিদানের ঘোষণা-

১. রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন, ‘বান্দার সব নেক আমলের সওয়াব দানের জন্য একটি নিয়ম থাকে। নেক আমল অনুযায়ী সওয়াব দেওয়া হয়। তা দশ গুণ থেকে সাতশ’ গুণ পর্যন্ত হয়ে থাকে। কিন্তু রোজার বিষয়টি সাধারণ নিয়মের উর্ধ্বে। বান্দা আমার জন্যই পানাহার ত্যাগ করেছে, যৌন ক্রিয়া থেকে বিরত থেকেছে। সুতরাং আমি নিজে তাকে বিশেষ প্রতিদান ও সওয়াব দেব।’ (মুসলিম)

রোজা রাখলে আগের জীবনের সব গুনাহ ক্ষমা করে দেওয়ার সুসংবাদ দিয়েছে নবিজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম। হাদসে এসেছে-

২. রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন, ‘যে ব্যক্তি পূর্ণ ঈমান ও বিশ্বাসের সঙ্গে আল্লাহ তাআলার সন্তুষ্টি ও সওয়াবের আশায় রমজানের রোজা রাখবে, আল্লাহ তাআলা তার আগের (জীবনের) সব গুনাহ ক্ষমা করে দেবেন।’ (বুখারি)

হাদিসে রোজাকে জাহান্নামের আগুন থেকে বাঁচার দুর্গ হিসেবে আখ্যায়িত করা হয়েছে। হাদিসে পাকে এসেছে-

৩. নবিজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন, ‘রোযা হলো জাহান্নামের আগুন থেকে বাঁচার শক্ত ঢাল এবং সুরক্ষিত বিশেষ দুর্গ।’ (তিরমিজি)

এ রোজাই কেয়ামতের দিন রোজাদারের জন্য শাফায়াতকারী হবে। রোজা বলবে, হে আল্লাহ! আমার জন্য এ বান্দা পানাহার ত্যাগ ও জৈবিক চাহিদা পূরণ করেনি। সুতরাং এ বান্দাকে ক্ষমা করে দাও হে প্রভু! তখন আল্লাহ তাআলা রোজাদারের সুপারিশ গ্রহণ করে নেবেন।

রোজা রেখে সতর্ক থাকতেও পরামর্শ দিয়েছেন নবিজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম। অন্য কারো মন্দ কথার জবাব না দিয়ে নিজেকে রোজাদার হিসেবে পরিচয় দেওয়ার মাধ্যমে মন্দ কাজ থেকে বিরত থাকার নসিহত পেশ করেছেন এভাবে-

‘তোমাদের কেউ যখন রোজা রাখবে, তখন দিনের বেলা সে যেন মুখে কোনো অশ্লীল কথা না বলে, হৈ চৈ না করে। যদি কেউ ইচ্ছাকৃতভাবে তার সঙ্গে ঝগড়া করতে আসে কিংবা গালিগালাজ করে; তাহলে সে যেন শুধু এটুকু বলে চুপ থাকে যে, ‘আমি রোজাদার’, আমি রোজাদার।’ (বুখারি)

কেননা রোজা রেখে মন্দ কথা ও মিথ্যা পরিহার না করতে পারলে এ রোজা মানুষের কোনো উপকারেই আসবে না। নবিজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেন-

‘রোজা রেখে যে ব্যক্তি মিথ্যা, মন্দকথা ও কুকর্ম ত্যাগ করে না, তার এই উপবাসে আল্লাহর কাছে কোনো কাজে আসে না।’ (বুখারি)

অন্য হাদিসে এসেছে-

অনেক রোজাদার এমন আছে যে, মন্দ কাজ থেকে বিরত না থাকার কারণে তাদের রোজা থেকে ক্ষুধা-তৃষ্ণার কষ্ট ছাড়া কিছুই অর্জিত হয় না।' (মুসনাদে আহমাদ)

যেহেতু রোজা আল্লাহর নির্দেশ ও ফরজ ইবাদত। সুতরাং তা প্রত্যেক প্রাপ্তবয়স্ক ও সক্ষম মুসলিম নারী-পুরুষের জন্য পালন করা আবশ্যক। আর যখন মানুষ রোজার বিধান পালন করে ছোট বড় সব গুনাহ থেকে বিরত থাকবে, তখনই রোজার সব সুফলগুলো পাওয়া যাবে।

পানাহার, স্ত্রী সহবাসসহ মিথ্যা, পরনিন্দা, গালিগালাজ, অশ্লীল কথা ও কাজ থেকে নিজেদের বিরত রাখতে রোজার পরিপূর্ণ উপকারিতা লাভ করা সম্ভব হবে। আল্লাহর নির্দেশ বাস্তবায়িত হবে। ফেরেশতাদের বৈশিষ্ট্য গুণ অর্জন করতে সক্ষম হবে মানুষ।

বিশেষ করে সেহরি ও ইফতার রোজার একটি গুরুত্বপূর্ণ অধ্যায়। আমরা যদি এটিকে সুন্নত হিসেবে পালন করি তবে তা শুধু শারীরের পক্ষেই ভালো নয় বরং প্রভূত কল্যাণ ও উপকারিতা পাওয়ার কারণও হয়ে থাকে।তাই সময় মতো সেহরি খাওয়া যেমন সুন্নত তেমনি সময় মতো ইফতার করাও সুন্নত। নবিজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এমনই করতেন।

নবিজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন, তোমরা সেহরি খাও; কারণ এতে বরকত রয়েছে । আর খেজুর দিয়ে ইফতার করা নবিজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের সুন্নত।

বিজ্ঞানের আধুনিক গবেষণায় এসেছে, খেজুরে ভিটামিন এ, বি, সি এবং ডির পাশাপাশি ক্যালসিয়াম, ফসফরাস এবং আরও অনেক দরকারী খনিজ রয়েছে যা শুধু হৃৎপিণ্ড, মস্তিষ্ক, লিভার, পেট এবং স্নায়ুকেই মজবুত করে না, বরং শরীরে প্রচুর পরিমাণে শক্তিও সঞ্চার করে।

আবার গ্রীষ্মকালের রোজায় মানুষ তৃষ্ণার্ত বোধ করে, তাহলে প্রাচীন চিকিৎসকদের গবেষণা অনুসারে যদি কেউ সেহরির সময় ঘুম থেকে ওঠার সঙ্গে সঙ্গে দু'চামচ খাঁটি মধু পানির সঙ্গে মিশিয়ে পান করেন তাহলে সারা দিন সে প্রশান্ত থাকবে। পানির তৃষ্ণা কম হবে। কারণ মধুর মতো বরকতময় খাবার এবং চিকিৎসা মাল্টিভিটামিনের খনিজ হওয়ার কারণে এটি রোজার সময় শারীরিক শক্তি পুনরুদ্ধার করে থাকে।

আল্লাহ তাআলা মুসলিম উম্মাহকে রোজার বিধান যথাযথ পালনের মাধ্যমে রোজা উপকারিতা ও তাকওয়া অর্জন করার তাওফিক দান করুন। আমিন।

রোজা রাখার ফলে শারীরিক সুস্থতাঃ

রোজা রাখলে শরীরের যেসব উপকার হয়-

হার্টের স্বাস্থ্য: রোজা হার্টের স্বাস্থ্য উন্নত করে এবং হার্টের ঝুঁকি কমায়।

মস্তিষ্কের কর্মক্ষমতা: রোজার মাধ্যমে মস্তিষ্কের কর্মক্ষমতা বৃদ্ধি পায় এবং মানসিক স্বাস্থ্য উন্নত হয়।

ডায়াবেটিস নিয়ন্ত্রণ: রোজা ডায়াবেটিসের নিয়ন্ত্রণে সাহায্য করে এবং ইনসুলিন প্রস্তুতি বাড়ায়।

কিডনির স্বাস্থ্য: রোজা কিডনির পরিচালনা উন্নত করে এবং শরীরের বর্জ্য পদার্থ নির্যাতন করে।

পরিপাকপ্রক্রিয়া উন্নতি: রোজা পরিপাকপ্রক্রিয়া উন্নত করে এবং খাবারের প্রস্তুতি সুষ্ঠু হয়।

ওজন নিয়ন্ত্রণ: রোজা ওজন নিয়ন্ত্রণে সাহায্য করে এবং শরীরে চর্বি প্রস্তুতি কমায়।

অপকারের অভ্যাস থেকে মুক্তি: ধূমপান এবং অন্যান্য নেশাজাতীয় অভ্যাস থেকে রক্ষা পাওয়া সম্ভব হয় এবং সুস্থ জীবনের পথে প্রেরণা দেয়।

রোজা মানুষের জন্য পশুত্বের স্বভাব থেকে বিরত থাকার অন্যতম প্রশিক্ষণ। কেননা পশুর বৈশিষ্ট্য হলো, যখন ইচ্ছে খায়, ইচ্ছে হলেই পান করে কিংবা যৌণ কাজে জড়িয়ে পড়ে। আর ফেরেশতারা এসব থেকে সম্পূর্ণ মুক্ত। তাদের না আছে পানাহারের চাহিদা বা প্রয়োজনীয়তা আর না আছে যৌন ক্রিয়ার প্রয়োজনীয়তা। আর মানুষ রমজানে রোজা রাখার মাধ্যমে পশুত্বের সে স্বভাব থেকে ফিরে থেকে ফেরেশতাদের স্বভাবের অনুসরণ করার মাধ্যমে নিজেদের মধ্যে আত্ম-নিয়ন্ত্রণ ও পরিমিতবোধ তৈরি করে থাকে।

রোজার সবচেয়ে বড় উপকারিতা হলো, তাকওয়া তথা মহান আল্লাহ তাআলা ভয় অর্জন করা। নিজেদের চরিত্রকে নিষ্কলুষ করে গড়ে তোলা। আল্লাহর হুকুম পালনে নিজের নফসকে নিয়ন্ত্রণ করতে সক্ষম হওয়া। শুধু তাই নয়, রোজা রাখার মাধ্যমে মানুষ কম খাওয়া, কম ঘুমানো ও কম কথা বলার প্রশিক্ষণ গ্রহণ করে থাকে। আর তাতে মানুষের আত্মার অনেক উন্নতি হয় ও সৌন্দর্য বেড়ে যায়।

তাকওয়া অর্জনে রোজার ভূমিকাঃ

তাকওয়া মানে পরিশুদ্ধ অন্তর, তাকওয়া মানে বিশুদ্ধ কর্ম। তাকওয়া মানে শুদ্ধাচার, নৈতিকতা, ন্যায়পরায়ণতা, মানবিক মূল্যবোধ, সামাজিক দায়বদ্ধতা ও মানবিকতা। সঠিকভাবে সিয়াম সাধনার মাধ্যমে মানুষ নিখাদ খাঁটি সোনায় পরিণত হতে পারে।

তাকওয়া হলো আল্লাহর ভালোবাসা হারানোর ভয়। আল্লাহর অসন্তোষের ভয়। প্রকৃত মুমিন তাকওয়া দ্বারাই পরিচালিত হন। তাকওয়া মানুষকে পাপ থেকে দূরে রাখে এবং সৎ কাজে অনুপ্রাণিত করে। আল্লাহ তাআলা বলেন, ‘তোমরা যারা ইমান এনেছ, তারা তাকওয়া অর্জন করো।’ (সুরা-৩৩ আহযাব, আয়াত: ৭০) কোরআনে কারিমে বলা হয়েছে, ‘যারা ইমান আনল এবং তাকওয়া অর্জন করল, তারা আল্লাহর বন্ধু; তাদের কোনো ভয় নেই, তারা চিন্তিতও হবে না।’ (সুরা-১০ ইউনুস, আয়াত: ৬২)।

ক্ষুধা-পিপাসার দহনজ্বালায় নফসকে দাহ করে পরিশুদ্ধ করা রোজার মূল লক্ষ্য। এটিই কোরআনের ভাষায় তাকওয়া বা খোদাভীতি। আল্লাহ তাআলা বলেন, ‘হে মুমিনগণ! তোমাদের জন্য রোজা ফরজ করা হয়েছে, যেমন ফরজ করা হয়েছিল তোমাদের পূর্ববর্তীদের ওপর; যাতে তোমরা তাকওয়া (আল্লাহর অসন্তুষ্টির ভীতি) লাভ করতে পারো।’ (সুরা-২ বাকারা, আয়াত: ১৮৩)।

আল্লাহ রাব্বুল আলামিন বলেন, ‘এই কোরআন মুত্তাকিদের জন্য হিদায়াত।’ (সুরা-২ বাকারা, আয়াত: ২)।

মানব প্রবৃত্তির যেসব নেতিবাচক গুণ বা বৈশিষ্ট্য মানুষের জ্ঞানকে বাধাগ্রস্ত করে, তাদের বলা হয় রিপু বা শত্রু। রিপু মূলত জ্ঞানের শত্রু। রিপুর অনিয়ন্ত্রিত ও অপব্যবহার

মানুষকে পশুর অধম করে দেয়। অধঃপতনের অতলে নিমজ্জিত করে। আল্লাহ তাআলা বলেন, ‘আমি বহু জিন ও ইনসানকে (তাদের কর্মফলের দোষে) জাহান্নামের জন্য নির্ধারণ করেছি—তাদের অন্তর আছে কিন্তু অনুধাবন করে না, চোখ আছে কিন্তু দেখে না, কান আছে কিন্তু শোনে না; তারা চতুষ্পদ জন্তু বা পশুতুল্য বরং তারা তার চেয়েও নিকৃষ্ট; তারা উদাসীন।’ (সুরা-৭ আরাফ, আয়াত: ১৭৯)।

তাকওয়া তথা রমজানের উদ্দেশ্য হলো ষড়্‌রিপুর ওপর নিয়ন্ত্রণ লাভের নৈতিক শক্তি অর্জন। রাসুলুল্লাহ (সা.) বলেন, ‘তোমরা এমনভাবে আল্লাহর ইবাদত করো, যেন তোমরা তাঁকে দেখছ; যদিও তোমরা তাঁকে দেখতে না পাও, তবে নিশ্চয়ই তিনি তোমাদের দেখছেন।’ (বুখারি: ৪৮)।

পঞ্চ ইন্দ্রিয়—চক্ষু, কর্ণ, নাসিকা, জিব, ত্বক ও দেহের প্রতিটি অঙ্গপ্রত্যঙ্গের সঠিক সংযত ও নিয়ন্ত্রিত ব্যবহার নিশ্চিত করাই হলো রোজা। দেহ ও মনকে অন্যায়, নিষিদ্ধ কাজ ও বস্তু থেকে বিরত রাখাই রোজার উদ্দেশ্য। সারা জীবন এগুলো নিয়ন্ত্রণে রাখার সক্ষমতা অর্জন করাই হলো রোজার সফলতা।

রাসুলুল্লাহ (সা.) বলেন, ‘মানবদেহে এমন একটি গোশতের টুকরা আছে, যা পরিশুদ্ধ হলে তার পুরো দেহ পরিশুদ্ধ হয়, সঠিকভাবে কাজ করে; আর তা বিনষ্ট হলে তার সমস্ত দেহই বিনষ্ট হয়, সঠিকভাবে কাজ করে না; জেনে রেখো তা হলো কলব।’ (বুখারি: ৫০)।

তাকওয়া হলো প্রতিটি অঙ্গপ্রত্যঙ্গের রোজা—মুখের বা জবানের রোজা হলো কুবাক্য ও কুকথা পরিহার করা; পরচর্চা, গিবত, শিকায়েত ও পরনিন্দা থেকে বিরত থাকা। চোখের রোজা হলো হারাম দৃশ্য দেখা বর্জন করা। কানের রোজা হলো হারাম শোনা থেকে

বেঁচে থাকা। হাতের রোজা হলো হারাম ধারণ ও হারাম স্পর্শ থেকে দূরে থাকা। পায়ের রোজা হলো অন্যায় পথে গমন বা পদচারণ না করা।

মন, মস্তিষ্ক ও অন্তরের রোজা হলো পাপ ও অন্যায় চিন্তা, কল্পনা ও পরিকল্পনা থেকে মুক্ত থাকা। আল্লাহ তাআলা বলেন, 'নিশ্চয়ই শ্রবণ, দর্শন ও চিন্তন এসব সম্পর্কে প্রশ্ন করা হবে।' (সুরা-১৭ বনি ইসরাইল, আয়াত: ৩৬)।

তাকওয়া মানে পরিশুদ্ধ অন্তর, তাকওয়া মানে বিশুদ্ধ কর্ম। তাকওয়া মানে শুদ্ধাচার, নৈতিকতা, ন্যায়পরায়ণতা, মানবিক মূল্যবোধ, সামাজিক দায়বদ্ধতা ও মানবিকতা। সঠিকভাবে সিয়াম সাধনার মাধ্যমে মানুষ নিখাদ খাঁটি সোনায় পরিণত হতে পারে।

রোযা 'রিয়া' মুক্ত ইবাদাত

রিয়া কিঃ

রিয়া (الرياء) অর্থ প্রদর্শন করা বা প্রদর্শনেচ্ছা। আল্লাহর জন্য করণীয় ইবাদত পালনের মধ্যে মানুষের দর্শন, প্রশংসা বা বাহবার ইচ্ছা পোষণ করাকে রিয়া বলে।

মুমিনের ইবাদত ধ্বংস করে তাকে জাহান্নামী বানানোর জন্য শয়তানের অন্যতম ফাঁদ 'রিয়া'। কুরআন-হাদীসে রিয়ার ভয়াবহতা সম্পর্কে সতর্ক করা হয়েছে। রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন: কিয়ামতের দিন সর্বপ্রথম যাদেরকে জাহান্নামে নিক্ষেপ করা হবে তাদের একজন বড় আলিম, একজন প্রসিদ্ধ শহীদ ও একজন বড় দাতা। তারা আজীবন আল্লাহর ইবাদত বন্দেগিতে কাটালেও রিয়ার কারণে তারা ধ্বংসগ্রস্ত হয়।[মুসলিম, আস-সহীহ ৩/১৫১৩-১৫১৪]।

বিভিন্ন হাদীসে রিয়াকে 'শিরক আসগার' বা ছোট শিরক এবং 'শিরক খাফী' বা লূক্কায়িত শিরক বলা হয়েছে। কারণ বান্দা আল্লাহর জন্য ইবাদত করলেও অন্য সৃষ্টি থেকেও সেজন্য 'কিছু' আশা করে আল্লাহর সাথে অন্যকে শরিক করে। এ শিরকের কারণে

মুসলিম কাফির বলে গণ্য না হলেও তার ইবাদত ধ্বংস ও অগ্রহণযোগ্য হয়ে যায়। মাহমূদ ইবন লাবীদ (রা) বলেন, রাসূলুল্লাহ (ﷺ) বলেছেন:

إِنَّ أَخْوَفَ مَا أَخَافُ عَلَيْكُمْ الشِّرْكُ الأَصْغَرُ قَالُوا وَمَا الشِّرْكُ الأَصْغَرُ يَا رَسُولَ اللَّهِ قَالَ الرِّيَاءُ يَقُولُ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ لَهُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ إِذَا جُزِيَ النَّاسُ بِأَعْمَالِهِمْ اذْهَبُوا إِلَى الَّذِينَ كُنْتُمْ تُرَاءُونَ فِي الدُّنْيَا فَانْظُرُوا هَلْ تَجِدُونَ عِنْدَهُمْ جَزَاءً

''আমি সবচেয়ে বেশি যে বিষয়টি তোমাদের ব্যাপারে ভয় পাই তা হলো শিরক আসগার বা ক্ষুদ্রতর শিরক। সাহাবীগণ প্রশ্ন করেন: হে আল্লাহর রাসূল, শিরক আসগার কী? তিনি বলেন: রিয়া বা প্রদর্শনেচ্ছা। কিয়ামতের দিন যখন মানুষদেরকে তাদের কর্মের প্রতিফল দেওয়া হবে তখন মহান আল্লাহ এদেরকে বলবেন, তোমরা যাদের দেখাতে তাদের নিকট যাও, দেখ তাদের কাছে তোমাদের পুরস্কার পাও কি না!''[আহমদ, আল-মুসনাদ ৫/৪২৮-৪২৯]।

এক হাদীসে আবূ সাঈদ খুদরী (রা) বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেন:

أَلا أُخْبِرُكُمْ بِمَا هُوَ أَخْوَفُ عَلَيْكُمْ عِنْدِي مِنْ الْمَسِيحِ الدَّجَّالِ قَالَ قُلْنَا بَلَى فَقَالَ الشِّرْكُ الْخَفِيُّ أَنْ يَقُومَ الرَّجُلُ يُصَلِّي فَيُزَيِّنُ صَلاتَهُ لِمَا يَرَى مِنْ نَظَرِ رَجُلٍ

''দাজ্জালের চেয়েও যে বিষয় আমি তোমাদের জন্য বেশি ভয় পাই সে বিষয়টি কি তোমাদেরকে বলব না? আমরা বললাম, হ্যাঁ, অবশ্যই বলুন। তিনি বলেন, বিষয়টি গোপন শির্ক। গোপন শির্ক এই যে, একজন সালাতে দাঁড়াবে এরপর যখন দেখবে যে মানুষ তার দিকে তাকাচ্ছে তখন সে সালাত সুন্দর করবে।''[বনু মাজাহ, আস-সুনান ২/১৪০৬]

রিয়া থেকে আত্মরক্ষার জন্য মুমিনের চেষ্টা করতে হবে যথাসম্ভব সকল নফল ইবাদত গোপনে করা। তবে যে ইবাদত প্রকাশ্যে করাই সুন্নাত-সম্মত তা প্রকাশ্যেই করতে হবে। রিয়ার ভয়ে কোনো নিয়মিত ইবাদত বা প্রকাশ্যে করণীয় ইবাদত বাদ দেওয়া যাবে না। রিয়ার অনুভূতি মন থেকে দূর করতে চেষ্টা করতে হবে। কখনো এসে গেলে বারবার তাওবা করতে হবে এবং আল্লাহর কাছে তাওফীক প্রার্থনা করতে হবে।

রিয়ার কারণ সমাজের মানুষদের কাছে সম্মান, মর্যাদা বা প্রশংসার আশা। আমাদের বুঝতে হবে যে, দুনিয়ায় কোনো মানুষই কিছু দিতে পারে না। যে মানুষকে দেখানোর বা শোনানোর জন্য, যার প্রশংসা বা পুরস্কার লাভের জন্য আমি লালায়িত হচ্ছি সে আমার মতই অসহায় মানুষ। আমার কর্ম দেখে সে প্রশংসা নাও করতে পারে। হয়ত তার প্রশংসা শোনার আগেই আমার মৃত্যু হবে। অথবা প্রশংসা করার আগেই তার মৃত্যু হবে। আর সে প্রশংসা বা সম্মান করলেও আমার কিছুই লাভ হবে না। আমার পালনকর্তার পুরস্কারই আমার জন্য যথেষ্ট। তিনি অল্পতেই খুশি হন ও বেশি পুরস্কার দেন। তিনি দিলে কেউ ঠেকাতে পারে না। আর তিনি না দিলে কেউ দিতে পারে না।

কা'ব ইবন মালিক (রা) বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন:

مَا ذِئْبَانِ جَائِعَانِ أُرْسِلا فِي غَنَمٍ بِأَفْسَدَ لَهَا مِنْ حِرْصِ الْمَرْءِ عَلَى الْمَالِ وَالشَّرَفِ لِدِينِهِ

"দুটি ক্ষুধার্ত নেকড়েকে একটি মেষপালের মধ্যে ছেড়ে দিলে নেকড়েদুটি মেশপালের যে ক্ষতি করে, সম্পদ ও সম্মানের লোভ মানুষের দীনের তার চেয়েও বেশি ক্ষতি করে।"[তিরমিযী, আস-সুনান ৪/৫৮৮]।

রোজা রিয়া মুক্ত ইবাদতঃ

অনেক আমল রয়েছে যা মানুষ রিয়া বা লোক দেখানোর জন্যও করে থাকে। নিজের স্বার্থ হাসিলের উদ্দেশে মানুষকে দেখানোর জন্য নামাজ, হজ্ব ও দান-সাদকাহ করে থাকে। পক্ষান্তরে রোজা তার ব্যতিক্রম, কারণ রোজা হলো সংযম বা আত্মনিয়ন্ত্রণ। কেউ ইচ্ছা করলেও রোজা কাউকে দেখাতে পারবে না। যদি কোন মানুষ রোজা রেখে অন্যের কাছে বলে বেড়ায় তবে তা নিছক উপবাস বলেই গণ্য হবে। রোজার প্রকৃত হক তার দ্বারা পালন হবে না।

আমরা যেহেতু রক্ত-মাংসের দুর্বল মানুষ, তাই সব সময়েই আমরা আমাদের কর্তব্য ঠিকঠাকভাবে পালন করতে পারি না। আমাদের আচার-আচরণ, ধার্মিকতা ও ইবাদাত, জটিল ও উদ্দাম ব্যস্ততায় ভরা দৈনন্দিন জীবনে ‘রিয়া’ বা আত্ম প্রদর্শনের (ভণ্ডামি) তলায় চাপা পড়ে যায় এবং তা অনেক সময়ে আমাদের সালাত, দান, খয়রাত, হজ ও যাকাত প্রদানে প্রকট হয়ে পড়ে। সে ইবাদাত আল্লাহর উদ্দেশ্যে হয় না যা আমরা লোক দেখানোর জন্য করে থাকি। কিন্তু রোযা বা সিয়াম পালন হচ্ছে এমন ইবাদাত যাতে রিয়া বা লোকদেখানোর কোনও প্রবণতা বা অবকাশ থাকে না। রোযা কেবল মাত্র আল্লাহর ভালোবাসা ও সন্তুষ্টি অর্জনের জন্য হয়।

সিয়ামের জন্য চাই মানসিক প্রস্তুতিঃ এটি সত্য যে, মানসিক প্রস্তুতি অনেক কিছুকে সহজ করে দেয়। কোনও কিছুর সাফল্যের প্রথম সোপান হল প্রস্তুতি। একজন মু’মিন তার দুনিয়াবী কাজের তুলনায় দ্বীনের কাজকে বেশি প্রাধান্য দেয়। সুতরাং, রমযান মাস আসার পূর্বেই রোযার জন্য মানসিকভাবে প্রস্তুতি থাকতে হবে এবং দৃঢ় সংকল্প নিতে হবে যে, আমি অবশ্যই রোযা পালন করব।

রোযা লোভ-লালসা থেকে মুক্ত করেঃ লোভ-লালসা মানুষকে ধ্বংস করে। সমাজে যত ধরনের বৈষম্য তা মানুষের লোভের প্রতিফলন। যিনি রোযা রাখেন তিনি কখনও হারাম জিনিসের প্রতি লোভ রাখতে পারেন না, বা অন্যের সম্পদের প্রতি দৃষ্টিপাতও করেন না।

সিয়াম বা রোযার বৈশিষ্ট্যই হল, এতে ইচ্ছা ও সঙ্কল্পে দৃঢ়তা সৃষ্টি হয়, চারিত্রিক মাহাত্ম্য অর্জিত হয়, শারীরিক ও মানসিক প্রশান্তি লাভ করা যায় এবং সর্বোপরি তা মুসলিম উম্মহর একতাবদ্ধ হওয়ার এক বাস্তব নিদর্শন।

পুরস্কারঃ সিয়ামের পুরস্কার হল জান্নাত। মহান আল্লাহ্‌তায়ালা ঘোষণা করেছেন : 'হে প্রশান্ত চিত্ত। তুমি তোমার প্রতিপালকের নিকট ফিরে এসো সন্তুষ্টি ও সন্তোষভাজন হয়ে, আমার দাসেদের অন্তর্ভুক্ত হও এবং আমার জান্নাতে প্রবেশ কর।' (সূরা ফাজর)।

নবী করিম সা. বলেছেন : 'তোমরা পাঁচ ওয়াক্ত নামায আদায় করবে, রমযান মাসের রোযা রাখবে, সম্পদের যাকাত আদায় করবে, সুশাসকের আনুগত্য করবে, তা হলেই তোমরা তোমাদের প্রতিপালকের জান্নাতে প্রবেশ করবে।' (আলমগীরী)

কুরআন ও সহীহ হাদীসের আলোকে রোযার গুরুত্ব ও ফযীলতঃ

রমযনের রোযা রমযনের রোযা ইসলামের পাঁচ স্তম্ভের অন্যতম। ঈমান, নামায ও যাকাতের পরই রোযার স্থান। রোযার আরবি শব্দ সওম, যার আভিধানিক অর্থ বিরত থাকা। পরিভাষায় সওম বলা হয়-প্রত্যেক সজ্ঞান, বালেগ মুসলমান নর-নারীর সুবহে সাদিক থেকে সূর্যাস্ত পর্যন্ত রোযার নিয়তে পানাহার, স্ত্রী সহবাস ও রোযাভঙ্গকারী সকল কাজ থেকে বিরত থাকা। সুতরাং রমযান মাসের চাঁদ উদিত হলেই প্রত্যেক সুস্থ, মুকীম

প্রাপ্তবয়স্ক পুরুষ এবং হায়েয-নেফাসমুক্ত প্রাপ্তবয়স্কা নারীর উপর পূর্ণ রমযান রোযা রাখা ফরয। এ সম্পর্কে আল্লাহ তাআলা ইরশাদ করেছেন-

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آَمَنُوا كُتِبَ عَلَيْكُمُ الصِّيَامُ كَمَا كُتِبَ عَلَى الَّذِينَ مِنْ قَبْلِكُمْ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ

(তরজমা) হে ঈমানদারগণ! তোমাদের উপর রোযা ফরয করা হয়েছে, যেমন ফরয করা হয়েছিল তোমাদের পূর্ববর্তীদের উপর, যেন তোমরা মুত্তাকী হতে পার।-সূরা বাকারা (২) : ১৮৩।

অন্য আয়াতে ইরশাদ করেছেন-

فَمَنْ شَهِدَ مِنْكُمُ الشَّهْرَ فَلْيَصُمْهُ

(তরজমা) সুতরাং তোমাদের মধ্যে যে ব্যক্তিই এ মাস পাবে, সে যেন অবশ্যই রোযা রাখে।- সূরা বাকারা (২) : ১৮৫।

হযরত আবু হুরায়রা রা. বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেছেন-

إذا رأيتم الهلال فصوموا وإذا رأيتموه فافطروا، فإن غم عليكم فصوموا ثلاثين،

وفي رواية : صوموا لرؤيته وأفطروا لرويته، فإن عم عليكم فاكملوا العدد.

যখন তোমরা (রমযানের) চাঁদ দেখবে, তখন থেকে রোযা রাখবে আর যখন (শাওয়ালের) চাঁদ দেখবে, তখন থেকে রোযা বন্ধ করবে। আকাশ যদি মেঘাচ্ছন্ন থাকে

তবে ত্রিশ দিন রোযা রাখবে।-সহীহ বুখারী, হাদীস : ১৯০৯; সহীহ মুসলিম, হাদীস : ১০৮০ (১৭-১৮)।

উল্লেখিত আয়াত ও হাদীস এবং এ বিষয়ক অন্যান্য দলীলের আলোকে প্রমাণিত যে, রমযান মাসের রোযা রাখা ফরয, ইসলামের আবশ্যক বিধানরূপে রোযা পালন করা ও বিশ্বাস করাও ফরয।

তাছাড়া কোনো শরয়ী ওযর ছাড়া কোন মুসলমান যদি রমযান মাসের একটি রোযাও ইচ্ছাকৃতভাবে পরিত্যাগ করে তাহলে সে বড় পাপী ও জঘন্য অপরাধীরূপে গণ্য হবে। দ্বীনের মৌলিক বিধান লঙ্ঘনকারী ও ঈমান-ইসলামের ভিত্তি বিনষ্টকারী হিসেবে পরিগণিত হবে। হাদীস শরীফে ইচ্ছাকৃতভাবে রোযা ত্যাগকারী ও ভঙ্গকারীর জন্য কঠিন শাস্তির কথা বর্ণিত হয়েছে।

হযরত আবু উমামা রা. বলেন, আমি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে বলতে শুনেছি,

بينما أنا نائم أتاني رجلان فأخذا بضبعي فأتيابي جبلا وعرا فقالا : اصعد؛ فقلت : إني لا أطيقه. فقالا: سنسهله لك، فصعدت حتى إذا كنت في سواء الجبل إذا بأصوات شديدة، قلت : ما هذه الأصوات؟ قالوا هذا عواء أهل النار، ثم انطلق بي، فإذا أنا بقوم معلقين بعراقيبهم، مشققة اشداقهم، تسيل اشداقهم دما. قال : قلت : من هؤلاء : قال : الذين يفطرون قبل تحلة صومهم.

رواه الحاكم فى المستدرك وقال : صحيح على شرط مسلم، ووافقه الذهبي، وذكره الهيثمى فى المجمع (240)، وقال : رجاله رجال الصحيح

আমি ঘুমিয়ে ছিলাম। স্বপ্নে দেখলাম আমার নিকট দুই ব্যক্তি আগমন করল। তারা আমার বাহুদ্বয় ধরে আমাকে এক দুর্গম পাহাড়ে নিয়ে এল। তারপর আমাকে বলল, আপনি পাহাড়ের উপর উঠুন। আমি বললাম, আমি তো উঠতে পারব না। তারা বলল, আমরা আপনাকে সহজ করে দিব। আমি উপরে উঠলাম। যখন পাহাড়ের সমতলে পৌঁছালাম, হঠাৎ ভয়ঙ্কর আওয়াজ শুনতে পেলাম। আমি বললাম, এ সব কিসের আওয়াজ? তারা বলল, এটা জাহান্নামীদের আর্তনাদ। তারপর তারা আমাকে নিয়ে এগিয়ে চলল। হঠাৎ কিছু লোক দেখতে পেলাম, যাদেরকে তাদের পায়ের মাংসপেশী দ্বারা ঝুলিয়ে রাখা হয়েছে। এবং তাদের মুখের দুই প্রান্ত ছিড়ে ফেলা হয়েছে এবং তা থেকে রক্ত ঝরছে। আমি বললাম, এরা কারা? তারা বলল, যারা ইফতারের সময় হওয়ার আগেই রোযা ভেঙ্গে ফেলে।-সহীহ ইবনে খুযাইমা, হাদীস : ১৯৮৬; সহীহ ইবনে হিববান, হাদীস : ৭৪৪৮; সুনানে নাসায়ী কুবরা, হাদীস : ৩২৮৬; মুসতাদরাকে হাকিম, হাদীস-১৬০৯; তবারানী, হাদীস : ৭৬৬৬।

রমযান মাসের একদিন রোযা না রাখলে মানুষ শুধু গুনাহগারই হয় না, ঐ রোযার পরিবর্তে আজীবন রোযা রাখলেও রমযানের এক রোযার যে মর্যাদা ও কল্যাণ, যে অনন্ত রহমত ও খায়ের-বরকত তা কখনো লাভ করতে পারবে না এবং কোনোভাবেই এর যথার্থ ক্ষতিপূরণ আদায় হবে না।

হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে মাসউদ রা. বলেন,

من افطر يوما من رمضان متعمدا من غير سفر ولا مرض لم يقضه ابدا، وان صام الدهر كله، ... وقد ذكره البخاري تعليقا بصيغة الجزم حيث قال : وبه قال ابن مسعود، وقال الشيخ محمد عوامه : وهذا الحديث موقوف لفظا ومرفوع حكما

যে ব্যক্তি অসুস্থতা ও সফর ব্যতীত ইচ্ছাকৃতভাবে রমযানের একটি রোযাও ভঙ্গ করে, সে আজীবন রোযা রাখলেও ঐ রোযার হক আদায় হবে না।-মুসান্নাফে ইবনে আবী

শাইবা, হাদীস : ৯৮৯৩; মুসান্নাফে আব্দুর রাযযাক, হাদীস : ৭৪৭৬; সহীহ বুখারী ৪/১৬০।

হযরত আলী রা. বলেন-

من افطر يوما من رضمان متعمدا لم يقضه أبدا طول الدهر.

যে ব্যক্তি ইচ্ছাকৃতভাবে রমযান মাসের একটি রোযা ভঙ্গ করবে, সে আজীবন সেই রোযার (ক্ষতিপূরণ) আদায় করতে পারবে না।- মুসান্নাফে ইবনে আবী শাইবা, হাদীস : ৯৮৭৮।

হাদীস শরীফে বর্ণিত রোযার কিছু ফযীলত ও বৈশিষ্ট্য এখানে উল্লেখ করা হলো :

১. রোযার প্রতিদান আল্লাহ রাববুল আলামীন নিজেই দিবেন এবং বিনা হিসাবে দিবেন:

প্রত্যেক নেক আমলের নির্ধারিত সওয়াব ও প্রতিদান রয়েছে, যার মাধ্যমে আল্লাহ তাআলা আমলকারীকে পুরস্কৃত করবেন। কিন্তু রোযার বিষয়টি সম্পূর্ণ আলাদা। কারণ রোযার বিষয়ে আছে আল্লাহ তাআলার পক্ষ হতে এক অনন্য ঘোষণা।

হযরত আবু হুরায়রা রা. থেকে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেছেন,

كل عمل ابن آدم يضاعف الحسنة بعشر أمثالها إلى سبعمائة ضعف، قال الله تعالى : الا الصوم فإنه لى وانا أجزى به يدع شهوته وطعامه من أجلى.

মানুষের প্রত্যেক আমলের প্রতিদান বৃদ্ধি করা হয়। একটি নেকীর সওয়াব দশ গুণ থেকে সাতাশ গুণ পর্যন্ত। আল্লাহ তাআলা ইরশাদ করেন, কিন্তু রোযা আলাদা। কেননা তা একমাত্র আমার জন্য এবং আমি নিজেই এর বিনিময় প্রদান করব। বান্দা একমাত্র আমার জন্য নিজের প্রবৃত্তিকে নিয়ন্ত্রণ করেছে এবং পানাহার পরিত্যাগ করেছে।-সহীহ মুসলিম, হাদীস : ১১৫১ (১৬৪); মুসনাদে আহমদ, হাদীস : ৯৭১৪; মুসান্নাফে ইবনে আবী শাইবা, হাদীস : ৮৯৮৭; সুনানে ইবনে মাজাহ, হাদীস : ১৬৩৮।

অন্য বর্ণনায় আছে-

عن أبى هريرة رضي الله عنه قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : قال الله : يترك طعامه وشرابه وشهوته من أجلى، الصيام لى وانا اجزى به، والحسنة بعشر امثالها.

হযরত আবু হুরায়রা রা. বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেছেন, আল্লাহ রাববুল আলামীন বলেন, বান্দা একমাত্র আমার জন্য তার পানাহার ও কামাচার বর্জন করে, রোযা আমার জন্যই, আমি নিজেই তার পুরস্কার দিব আর (অন্যান্য) নেক আমলের বিনিময় হচ্ছে তার দশগুণ।-সহীহ বুখারী, হাদীস : ১৮৯৪; মুসনাদে আহমদ, হাদীস : ৯৯৯৯; মুয়াত্তা মালেক ১/৩১০।

রোযা বিষয়ে-অন্য বর্ণনায়-আললাহ তাআলা বলেন, ‘‘প্রত্যেক ইবাদতই ইবাদতকারী ব্যক্তির জন্য, পক্ষান্তরে রোযা আমার জন্য। আমি নিজেই এর প্রতিদান দিব। (সহীহ বুখারী হাদীস-১৯০৪)।

এ কথার তাৎপর্য হল, যদিও প্রকৃতপক্ষে সকল ইবাদতই আল্লাহর জন্য, তার সন্তুষ্টি ও নৈকট্য লাভের উদ্দেশ্যেই হয়ে থাকে। তবুও রোযা ও অন্যান্য ইবাদতের মধ্যে একটি

বিশেষ পার্থক্য রয়েছে। তা হল-অন্যান্য সকল ইবাদতের কাঠামোগত ক্রিয়াকলাপ, আকার-আকৃতি ও নিয়ম পদ্ধতি এমন যে, তাতে আল্লাহর সন্তুষ্টি লাভের উদ্দেশ্য ছাড়াও ইবাদতকারীর নফসের স্বাদ গ্রহণের সুযোগ বিদ্যমান থাকে। মুখে প্রকাশ না করলেও অনেক সময় তার অন্তরে রিয়া তথা লোক দেখানো ভাব সৃষ্টি হতে পারে। তার অনুভূতির অন্তরালে এ ধরনের ভাব লুকিয়ে থাকে। তা সে অনুভব করতে না পারলেও তার ভিতরে অবচেতনভাবে বিদ্যমান থাকে। ফলে সেখানে নফসের প্রভাব এসে যায়। পক্ষান্তরে রোযা এমন এক পদ্ধতিগত ইবাদত, তার-আকার-আকৃতি এরূপ যে, আল্লাহর সন্তুষ্টি লাভের উদ্দেশ্য ব্যতীত ইবাদতকারীর নফসের স্বাদ গ্রহণের বিন্দুমাত্র সুযোগ নেই। রোযাদার ব্যক্তি নিজ মুখে রোযার বিষয়টি প্রকাশ না করলে সাধারণত তা আলেমুল গায়েব আল্লাহ তাআলা ব্যতীত কারো নিকট প্রকাশিত হওয়ার মত নয়। তাই রোযার ক্ষেত্রে মাওলার সন্তুষ্টির বিষয়টি একনিষ্ঠভাবে প্রতিভাত হয়। একারণেই রোযা ও অন্যান্য ইবাদতের মাঝে এরূপ বিস্তর ব্যবধান।

রোযার এত বড় ফযীলতের কারণ এটাও হতে পারে যে, রোযা ধৈর্য্যের ফলস্বরূপ। আর ধৈর্য্যধারণকারীদের জন্য আল্লাহ তাআলার সুসংবাদ হল-

إِنَّمَا يُوَفَّى الصَّابِرُونَ أَجْرَهُمْ بِغَيْرِ حِسَابٍ

ধৈর্য্যধারণকারীগণই অগণিত সওয়াবের অধিকারী হবে।-সূরা যুমার (৩৯) : ১০।

সব মাখলুকের স্রষ্টা, বিশ্বজাহানের প্রতিপালক, আল্লাহ তাআলা নিজেই যখন এর পুরস্কার দিবেন, তখন কী পরিমাণ দিবেন? ইমাম আওযায়ী রাহ. এ হাদীসের ব্যাখ্যায় বলেছেন- আল্লাহ যে রোযাদারকে প্রতিদান দিবেন, তা মাপা হবে না, ওজন করা হবে না অর্থাৎ বিনা হিসাবেই দিবেন।

২. আল্লাহ তাআলা রোযাদারকে কেয়ামতের দিন পানি পান করাবেন:

হযরত আবু মুসা রা. হতে বর্ণিত,

ان الله تبارك وتعالى قضى على نفسه أنه من اعطش نفسه له في صائف سقاه يوم العطش،

رواه البزار، وذكره الهيثمي في المجمع (5095)، وقال : رواه البزار، ورجاله موثقون. وقال المنذري في الترغيب (1478)، : إسناده حسن، ان شاء الله.

আল্লাহ রাববুল আলামীন নিজের উপর অবধারিত করে নিয়েছেন, যে ব্যক্তি তার সন্তুষ্টির জণ্য গ্রীষ্মকালে (রোযার কারণে) পিপাসার্ত থেকেছে, তিনি তাকে তৃষ্ণার দিন (কিয়ামতের দিন) পানি পান করাবেন।-মুসনাদে বাযযার, হাদীস : ১০৩৯; মাজমাউয যাওয়াইদ, হাদীস : ৫০৯৫।

হযরত আবু হুরায়রা রা. হতে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেছেন,

قال الله تعالى : الصيام لى وانا اجزى به ... فان لهم يوم القيامة حوضا ما يرده غير الصائم،

رواه البزار وذكره الهيثمي في المجمع، (5093)، وقال : رواه البزار، ورجاله موثقون.

আল্লাহ তাআলা বলেন, রোযা আমার জন্য, আমি নিজেই এর প্রতিদান দিব। কেয়ামতের দিন রোযাদারদের জন্য একটি বিশেষ পানির হাউজ থাকবে, যেখানে রোযাদার ব্যতীত

অন্য কারো আগমন ঘটবে না।-মুসনাদে বাযযার, হাদীস : ৮১১৫; মাজমাউয যাওয়াইদ, হাদীস : ৫০৯৩।

৩. রোযা হল জান্নাত লাভের পথ:

عن حذيفة رضي الله عنه قال : اسندت النبي صلى الله عليه وسلم إلى صدري، فقال : من قال : لا إله إلا الله ختم له بها دخل الجنة، ومن صام يوما ابتغاء وجه الله ختم له به، دخل الجنة، ومن تصدق بصدقة ختم له بها، دخل الجنة، رواه احمد، وذكره الهيثمى فى المجمع (11935) وقال : رواه احمد ورجاله رجال الصحيح غير عثمان بن مسلم البتى وهو ثقة، فالحديث صحيح كما قاله الشيخ احمد شاكر والشيخ شعيب الارنؤوط.

হযরত হুযায়ফা রা. বলেন, আমি আল্লাহর নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে আমার বুকের সাথে মিলিয়ে নিলাম, তারপর তিনি বললেন, যে ব্যক্তি লাইলাহা ইল্লাল্লাহু' বলে মৃত্যুবরণ করবে সে জান্নাতে প্রবেশ করবে, যে ব্যক্তি আল্লাহর সন্তুষ্টি কামনায় একদিন রোযা রাখবে, পরে তার মৃত্যু হয় সে জান্নাতে প্রবেশ করবে। যে ব্যক্তি আল্লাহর সন্তুষ্টির উদ্দেশ্যে কোনো দান-সদকা করে তারপর তার মৃত্যু হয়, সে জান্নাতে প্রবেশ করবে।-মুসনাদে আহমদ, হাদীস : ২৩৩২৪; মুসনাদে বাযযার, হা.২৮৫৪।

عن أبي أمامة قال : أتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقلت : مرني بعمل يدخلني الجنة، قال : عليك بالصوم، فانه لا عدل له، ثم أتيته الثانية، فقال لي : عليك بالصيام.

হযরত আবু উমামা রা. হতে বর্ণিত, তিনি বলেন, আমি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের দরবারে আগমন করে বললাম, ইয়া রাসূলুল্লাহ! আমাকে এমন একটি আমল বলে দিন, যার দ্বারা আমি জান্নাতে প্রবেশ করতে পারব। তিনি বলেন, তুমি রোযা রাখ, কেননা এর সমতুল্য কিছু নেই। আমি পুনরায় তার নিকট এসে একই কথা বললাম। তিনি বললেন, তুমি রোযা রাখ।-মুসনাদে আহমদ, হাদীস : ২২১৪৯; সহীহ

ইবনে খুযাইমা, হাদীস : ১৮৯৩; সহীহ ইবনে হিববান, হাদীস : ৩৪২৬; সুনানে নাসায়ী, হাদীস : ২৫৩০।

৪. **রোযাদারগণ জান্নাতে প্রবেশ করবে 'রাইয়ান' নামক বিশেষ দরজা দিয়ে:**

হযরত সাহল ইবনে সা'দ রা. হতে বর্ণিত, নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেছেন,

إن فى الجنة بابا يقال له الريَّان يدخل منه الصائمون يوم القيامة، لا يدخل منه أحد غيرهم، يقال : اين الصائمون فيقومون، لا يدخل منه أحد غيرهم، فاذا دخلوا اغلق، فلم يدخل منه احد.

জান্নাতে একটি দরজা আছে, যার নাম রাইয়ান। কিয়ামতের দিন এ দরজা দিয়ে কেবল রোযাদার ব্যক্তিরাই প্রবেশ করবে। অন্য কেউ প্রবেশ করতে পারবে না। ঘোষণা করা হবে- কোথায় সেই সৌভাগ্যবান রোযাদারগণ? তখন তারা উঠে দাড়াবে। তারা ব্যতীত কেউ এ দরজা দিয়ে প্রবেশ করতে পারবে না। অতঃপর রোযাদারগণ যখন প্রবেশ করবে, তখন তা বন্ধ করে দেওয়া হবে। ফলে কেউ ঐ দরজা দিয়ে প্রবেশ করতে পারবে না।-সহীহ বুখারী, হাদীস : ১৮৯৬; সহীহ মুসলিম, হাদীস : ১১৫২; মুসনাদে আহমদ, হাদীস : ২২৮১৮।

হযরত সাহল ইবেন সা'দ হতে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেছেন-

ان للصائمين بابا فى الجنة يقال له : الريان، لا يدخل منه غيرهم اذا دخل آخرهم اغلق، ومن دخل منه شرب، ومن شرب منه لم يظمأ ابدًا.

قال الترمذی : هذا حديث حسن صحيح غريب.

জান্নাতে রোযাদার ব্যক্তিদের জন্য একটি বিশেষ দরজা আছে, যার নাম রাইয়ান। রোযাদারগণ ছাড়া অন্য কেউ এই দরজা দিয়ে প্রবেশ করতে পারবে না। যখন সর্বশেষ রোযাদার ব্যক্তি তাতে প্রবেশ করবে, তখন সেই দরজা বন্ধ করে দেওয়া হবে। যে ব্যক্তি ঐ দরজা দিয়ে প্রবেশ করবে, সে (জান্নাতের পানীয়) পান করবে। আর যে পান করবে, সে কখনো পিপাসার্ত হবে না।-মুসনাদে আহমদ, হাদীস : ২২৮৪২; সহীহ ইবনে খুযায়মা, হাদীস : ১৯০২; সুনানে তিরমিযী, হাদীস : ৭৬৫; সুনানে নাসায়ী, হাদীস : ২৫৪৪।

হযরত আবু হুরায়রা রা. বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেছেন,

لكل اهل عمل باب من ابواب الجنة يدعون منه بذلك العمل، ولاهل الصيام باب يدعون منه، يقال له : الريان، فقال أبو بكر : يا رسول الله، هل احد يدعى من تلك الأبواب كلها؟ قال : نعم، وارجو أن تكون منهم يا ابا بكر،

প্রত্যেক প্রকারের নেক আমলকারীর জন্য জান্নাতে একটি করে বিশেষ দরজা থাকবে, যার যে আমলের প্রতি অধিক অনুরাগ ছিল তাকে সে দরজা দিয়ে আহবান করা হবে। রোযাদারদের জন্যও একটি বিশেষ দরজা থাকবে, যা দিয়ে তাদেরকে ডাকা হবে, তার নাম হবে ‘রাইয়ান’। আবু বকর রা. বললেন, ইয়া রাসূলুল্লাহ! এমন কেউ কি হবেন, যাকে সকল দরজা থেকে আহবান করা হবে? তিনি বলেন, হ্যাঁ, আমি আশা রাখি তুমিও তাদের একজন হবে।-মুসনাদে আহমদ, হাদীস : ৯৮০০; মুসান্নাফে ইবনে আবি শাইবা, হাদীস : ৩২৬২৮।

এ সম্পর্কে বুখারী-মুসলিমে বর্ণিত হয়েছে, হযরত আবু হুরায়রা রা. বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেছেন-

من أنفق زوجين في سبيل الله نودي من أبواب الجنة : يا عبد الله هذا خير، فمن كان من أهل الصلاة دعي من باب الصلاة، ومن كان من أهل الجهاد دعي من باب الجهاد، ومن كان من أهل الصيام دعي من باب الريان، ومن كان من أهل الصدقة دعي من باب الصدقة، فقال أبو بكر : بأبي أنت وأمي، يا رسول الله! ما على من دعي من تلك الأبواب من ضرورة فهل يدعى أحد من تلك الأبواب كلها؟ قال : نعم، وأرجو أن تكون منهم.

(সহীহ বুখারী, হাদীস-১৮৯৬, ৩৬৬৬; সহীহ মুসলিম, হাদীস ১০২৭ (৮৫-৮৬); মুসনাদে আহমাদ, হাদীস-৭৬৩৩; সহীহ ইবনে হিববান, হাদীস -৩০৯)।

৫. রোযা জাহান্নাম থেকে রক্ষাকারী ঢাল ও দুর্গ:

হযরত জাবির রা. হতে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন,

قال ربنا عز وجل : الصيام جنة يستجن بها العبد من النار وهو لى وانا أجزى به.

وهذا حديث صحيح بطرقه وشواهده، قاله الشيخ شعيب الارنؤوط

আমাদের মহান রব ইরশাদ করেছেন- রোযা হল ঢাল। বান্দা এর দ্বারা নিজেকে জাহান্নামের আগুন থেকে রক্ষা করবে। রোযা আমার জন্য আর আমিই এর পুরস্কার দিব।-মুসনাদে আহমদ, হাদীস : ১৪৬৬৯; শুয়াবুল ঈমান বাইহাকী, হাদীস : ৩৫৭০।

উসমান ইবনে আবিল আস রা. বর্ণনা করেন, আমি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে বলতে শুনেছি,

الصيام جنة من النار كجنة احدكم من القتال،

রোযা হল জাহান্নাম থেকে রক্ষাকারী ঢাল, যুদ্ধক্ষেত্রে তোমাদের (শত্রুর আঘাত হতে রক্ষাকারী) ঢালের মত।-মুসনাদে আহমদ, হাদীস : ১৬২৭৮; সহীহ ইবনে খুযাইমা, হাদীস : ২১২৫; সহীহ ইবনে হিববান, হাদীস : ৩৬৪৯; সুনানে ইবনে মাজাহ, হাদীস : ১৬৩৯।

হযরত আবু হুরায়রা রা. হতে বর্ণিত, নবী কারীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়সাল্লাম ইরশাদ করেছেন-

الصيام جنة، وحصن حصين من النار

রোযা হল (জাহান্নাম থেকে পরিত্রান লাভের) ঢাল এবং সুরক্ষিত দুর্গ।-মুসনাদে আহমদ, হাদীস-৯২২৫; বাইহাকী, শুয়াবুল ঈমান, হাদীস-৩৫৭১।

৬. **<u>রোযা কিয়ামতের দিন সুপারিশ করবে:</u>**

হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে আমর রা. হতে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেছেন-

الصيام والقرآن يشفعان للعبد يوم القيامة، يقول الصيام : اى رب منعته الطعام والشهوة فشفعنى فيه، ويقول القرآن : منعته النوم بالليل، فشفعنى فيه، قال : فيشفعان له.

رواه أحمد، والحاكم فى المستدرك وقال : صحيح على شرط مسلم، ووافقه الذهبي، وذكره الهيثمي فى المجمع، وقال : رواه أحمد والطبرانى فى الكبير، ورجال الطبرانى رجال الصحيح.

রোযা ও কুরআন কিয়ামতের দিন বান্দার জন্য সুপারিশ করবে। রোযা বলবে, হে রব! আমি তাকে খাদ্য ও যৌন সম্ভোগ থেকে বিরত রেখেছি। অতএব তার ব্যাপারে আমার সুপারিশ গ্রহণ করুন। কুরআন বলবে, আমি তাকে রাতের ঘুম থেকে বিরত রেখেছি, (অর্থাৎ না ঘুমিয়ে সে তেলাওয়াত করেছে) অতএব তার ব্যাপারে আমার সুপারিশ কবুল করুন। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন, অতঃপর তাদের উভয়ের সুপারিশ গ্রহণ করা হবে।-মুসনাদে আহমদ, হাদীস : ৬৬২৬; মুসতাদরাকে হাকিম, হাদীস : ২০৮০; বাইহাকী শুয়াবুল ঈমান, হাদীস : ১৯৯৪।

৭. **রোযাদারের সকল গুনাহ মাফ হয়ে যায়:**

হযরত আবু হুরায়রা রা. হতে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেছেন-

من صام رمضان ايمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه،

যে ব্যক্তি ঈমানের সাথে সওয়াবের আশায় রমযান মাসের রোযা রাখবে, তার পূর্ববর্তী গুনাহসমূহ ক্ষমা করে দেওয়া হবে।- সহীহ বুখারী, হাদীস : ৩৮, ২০১৪; সহীহ মুসলিম

৭৬০(১৬৫); মুসনাদে আহমদ, হাদীস : ৭১৭০; মুসান্নাফে ইবনে আবী শাইবা, হাদীস : ৮৯৬৮।

হযরত আবদুর রহমান ইবনে আওফ রা. বর্ণনা করেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেছেন,

ان الله عز وجل فرض صيام رمضان وسننت قيامه، فمن صامه وقامه ايمانا واحتسابا خرج من الذنوب كيوم ولدته أمه.

আল্লাহ তাআলা তোমাদের উপর রমযানের রোযা ফরয করেছেন, আর আমি কিয়ামুল লাইল অর্থাৎ তারাবীহ'র নামাযকে সুন্নত করেছি। সুতরাং যে ব্যক্তি ঈমানের সাথে সওয়াবের আশায় রমযানের সিয়াম ও কিয়াম আদায় করবে, সে ঐ দিনের মতো নিষ্পাপ হয়ে যাবে যেদিন সে মায়ের গর্ভ থেকে সদ্যভূমিষ্ঠ হয়েছিল।-মুসনাদে আহমদ, হাদীস-১৬৬০, মুসান্নাফে ইবনে আবি শাইবা, হাদীস-৭৭৮৭, মুসনাদে বাযযার, হাদীস-১০৪৮, সহীহ ইবনে খুযাইমা, হাদীস-২২০১, সুনানে নাসায়ী, হাদীস-২৫১৮।

৮. **রোযা গুনাহের কাফফারা:**

রোযা গুনাহের কাফফারা হওয়া কুরআনের আয়াতের মাধ্যমে প্রমাণিত। আল্লাহ তাআলা বিভিন্ন প্রকার গুনাহের কাফফারা স্বরূপ রোযার বিধান নাযিল করেছেন। যেমন ইহরাম অবস্থায় (অসুস্থতা বা মাথার কষ্টের কারণে) মাথা মুন্ডানোর কাফফারা স্বরূপ (২:১৯৬), কোন যিম্মী বা চুক্তিবদ্ধ কাফেরকে ভুলক্রমে হত্যার কাফফারা স্বরূপ (৪:৯২), কসমের কাফফারা স্বরূপ (৫:৮৯) এবং যিহারের কাফফারা স্বরূপ (৫৮:৩-৪); আল্লাহ তাআলার পক্ষ থেকে বিভিন্ন মেয়াদে রোযার হুকুম দেওয়া হয়েছে। তাই সহজেই বোধগম্য যে, রোযা বান্দার পাপসমূহকে ধুয়ে-মুছে রোযাদারকে পরিশুদ্ধ করে।

হযরত হুযায়ফা রা. হতে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেছেন,

فتنة الرجل فى اهله وماله ونفسه وولده وجاره تكفرها الصلاة والصيام والصدقة والأمر بالمعروف والنهى عن المنكر.

মানুষের জন্য তার পরিবার, ধন-সম্পদ, তার আত্মা, সন্তান-সন্ততি ও প্রতিবেশী ফিতনা স্বরূপ। তার কাফফারা হল নামায, রোযা, দান-সদকাহ, সৎকাজের আদেশ ও অসৎ কাজের নিষেধ।-সহীহ বুখারী, হাদীস : ৫২৫, ১৮৬৫; সহীহ মুসলিম, হাদীস : ২৮৯২-২৬, মুসনাদে আহমদ, হাদীস : ২৩২৮০, সুনানে তিরমিযী, হা. ২২৫৮।

৯. <u>রোযাদারের মুখের গন্ধ মিশকের চেয়েও সুগন্ধিযুক্ত:</u>

হযরত আবু হুরায়রা রা. হতে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেছেন-

والذى نفس محمد بيده لخلوف فم الصائم اطيب عند الله من ريح المسك،

সেই সত্তার শপথ, যার হাতে মুহাম্মাদের জীবন, রোযাদারের মুখের দুর্গন্ধ আল্লাহর নিকট মিশকের সুগন্ধির চেয়েও অধিক সুগন্ধিময়।-সহীহ বুখারী, হাদীস : ১৯০৪; সহীহ মুসলিম, হাদীস : ১১৫১ (১৬৩); মুসনাদে আহমদ, হাদীস : ৭১৭৪; সুনানে নাসায়ী, হাদীস : ২৫২৩; সুনানে ইবনে মাজাহ- ১৬৩৮।

১০. **রোযাদারের জন্য দুটি আনন্দের মুহূর্ত:**

হযরত আবু হুরায়রা রা. হতে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেছেন,

للصائم فرحتان يفرحهما اذا افطر فرح، واذا لقى ربه فرح بصومه، وفى رواية : اذا لقى الله فجزاه فرح،

রোযাদারের জন্য দুটি আনন্দের মুহূর্ত রয়েছে, যখন সে আনন্দিত হবে। এক. যখন সে ইফতার করে তখন ইফতারের কারণে আনন্দ পায়। দুই. যখন সে তার রবের সাথে মিলিত হবে তখন তার রোযার কারণে আনন্দিত হবে। অন্য বর্ণনায় রয়েছে, যখন সে আল্লাহর সাথে মিলিত হবে, আর তিনি তাকে পুরস্কার দিবেন, তখন সে আনন্দিত হবে।-সহীহ বুখারী, হাদীস : ১৯০৪, ১৮৯৪; সহীহ মুসলিম, হাদীস : ১১৫১ (১৬৩, ১৬৪, ১৬৫); মুসনাদে আহমদ, হাদীস : ৯৪২৯, ৭১৭৪; সুনানে তিরমিযী, হাদীস : ৭৬৬।

১১. **রোযাদার পরকালে সিদ্দীকীন ও শহীদগণের দলভুক্ত থাকবে:**

হযরত আমর ইবনে মুররা আলজুহানী রা. হতে বর্ণিত,

جاء رجل الى النبى صلى الله عليه وسلم فقال : يا رسول الله! أرايت ان شهدت ان لا اله الا الله وانك رسول الله، وصليت الصلوات الخمس واديت الزكاة وصمت رمضان وقمته فممن أنا؟ قال : من الصديقين والشهداء،

এক ব্যক্তি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের দরবারে এসে বললো, ইয়া রাসূলাল্লাহ! আমি যদি একথার সাক্ষ্য দিই যে, আল্লাহ ছাড়া আর কোনো মাবুদ নেই

এবং অবশ্যই আপনি আল্লাহর রাসূল, আর আমি যদি পাঁচ ওয়াক্ত নামায আদায় করি, যাকাত প্রদান করি, রমযান মাসের সিয়াম ও কিয়াম (তারাবীহসহ অন্যান্য নফল) আদায় করি তাহলে আমি কাদের দলভুক্ত হব? তিনি বললেন, সিদ্দীকীন ও শহীদগণের দলভুক্ত হবে।-মুসনাদে বাযযার, হাদীস : ২৫, সহীহ ইবনে খুযাইমা, হাদীস : ২২১২, সহীহ ইবনে হিববান, হাদীস : ৩৪২৯

১২. **রোযাদারের দুআ কবুল হয়:**

হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে আমর রা. হতে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেছেন-

إن للصائم عند فطره لدعوة ما ترد.

قال البوصيرى : اسناده صحيح.

ইফতারের সময় রোযাদার যখন দুআ করে, তখন তার দুআ ফিরিয়ে দেওয়া হয় না। (অর্থাৎ তার দুআ কবুল হয়)।-সুনানে ইবনে মাজাহ, হাদীস : ১৭৫৩।

হযরত আবু হুরায়রা হতে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেছেন,

ثلاثة لا ترد دعوتهم الامام العادل، والصائم حتى يفطر، ودعوة المظلوم، تحمل على الغمام، وتفتح لها ابواب السماوات، ويقول الرب عز وجل : وعزتى لانصرنك ولو بعد حين.

وقال الترمذى : هذا حديث حسن.

তিন ব্যক্তির দুআ ফিরিয়ে দেওয়া হয় না (অর্থাৎ তাদের দুআ কবুল করা হয়) ন্যায়পরায়ন শাসকের দুআ; রোযাদার ব্যক্তির দুআ ইফতারের সময় পর্যন্ত ও মজলুমের দুআ। তাদের দুআ মেঘমালার উপরে উঠিয়ে নেওয়া হয় এবং এর জন্য সব আসমানের দরজাসমূহ খুলে দেওয়া হয়। তখন আল্লাহ তাআলা ঘোষণা করেন, আমার ইয্যতের কসম! বিলম্বে হলেও অবশ্যই আমি তোমাকে সাহায্য করব।-মুসনাদে আহমদ, হাদীস : ৮০৪৩; সুনানে তিরমিযী, হাদীস : ৩৫৯৮; সুনানে ইবনে মাজাহ, হাদীস : ১৭৫২; সহীহ ইবনে হিববান, হাদীস : ৩৪২৮।

হযরত আবু হুরায়রা রা. র্বণনা করেন, নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেছেন,

الصائم لا ترد دعوته،

وهذا الحديث اسناده حسن قاله الشيخ محمد عوامة

রোযাদারের দুআ ফিরিয়ে দেওয়া হয় না।-মুসান্নাফে ইবনে আবী শাইবা, হাদীস : ৮৯৯৫।

১৩. **রোযা হিংসা-বিদ্বেষ দূর করে দেয়:**

صوم شهر الصبر وثلاثة أيام من كل شهر يذهبن وحر الصدر،

وقال المنذرى : ورجاله رجال الصحيح، ورواه احمد وابن حبان والبيهقى الثلاثة من حديث الأعرابى ولم يسموه، (اى ابن عباس(

হযরত ইবনে আববাস রা. হতে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেছেন, সবরের মাসের (রমযান মাস) রোযা এবং প্রতি মাসের তিন দিনের (আইয়্যামে বীয) রোযা অন্তরের হিংসা-বিদ্বেষ দূর করে দেয়। -মুসনাদে বাযযার, হাদীস : ১০৫৭; মুসনাদে আহমদ, হাদীস : ২৩০৭০; সহীহ ইবনে হিববান, হাদীস : ৬৫২৩।

১৪. আল্লাহর নৈকট্য লাভের শ্রেষ্ঠ মাধ্যম:

عن أبى أمامة قال : قلت يا رسول الله! مرنى بعمل قال : عليك بالصوم فإنه لا عدل له قلت : يا رسول الله! مرنى بعمل قال : عليك بالصوم، فانه لا عدل له.

হযরত আবু উমামা রা. বর্ণনা করেন, আমি বললাম, ইয়া রাসূলাল্লাহ! আমাকে কোনো আমলের আদেশ করুন। তিনি বললেন, তুমি রোযা রাখ, কেননা এর সমতুল্য কিছু নেই। আমি পুনরায় বললাম, ইয়া রাসূলাল্লাহ! আমাকে কোনো নেক আমলের কথা বলুন, তিনি বললেন, তুমি রোযা রাখ, কেননা এর কোনো সমতুল্য কিছু নেই।-সহীহ ইবনে খুযাইমা, হাদীস : ১৮৯৩; মুসনাদে আহমদ, হাদীস : ২২১৪০; সহীহ ইবনে হিববান, হাদীস : ৩৪২৫; সুনানে নাসায়ী কুবরা, হাদীস : ২৫৩৩।

عن أبى أمامة الباهلى قال : قلت يا رسول الله مرنى بأمر ينفعنى الله به، قال : عليك بالصوم فانه لا مثل له.

هذا حديث اسناده صحيح على شرط مسلم قاله الشيخ شعيب وكذا قاله الشيخ أحمد شاكر.

হযরত আবু উমামা রা. হতে বর্ণিত, তিনি বলেন, আমি বললাম, ইয়া রাসূলাল্লাহ! আমাকে এমন কোনো আমলের আদেশ করুন, যার দ্বারা আল্লাহ তাআলা আমাকে উপকৃত করবেন। তিনি বললেন, তুমি রোযা রাখ, কেননা তার তুলনা হয় না।-সুনানে

নাসায়ী, হাদীস : ২৫৩১; মুসনাদে আহমদ, হাদীস : ২২১৪১; বাইহাকী, শুয়াবুল ঈমান ৩৮৯৩ তাবারানী, হাদীস : ৭৪৬৩।

রমযান হল খালেস ইবাদতের মৌসুম। তাই এ মাসের সময়গুলো যতটা শুধু আল্লাহর সাথে কাটানো যায় ততটা ভালো। আল্লাহ তাআলা আমাদের সকলকে হাদীস অনুযায়ী আমল করার ও উক্ত ফযীলত লাভ করার তাওফীক দান করুন। আমীন। ইয়া রাববাল আলামীন।

ক্ষমা লাভের সুবর্ণ সুযোগ

রমজান হল প্রতিফলন, ভক্তি এবং আধ্যাত্মিক পুনর্জীবনের মাস। এর অনেক গুণাবলীর মধ্যে, রমজানকে আল্লাহর ক্ষমার মাস হিসাবে উদযাপন করা হয়, যা বিশ্বাসীদেরকে তাদের আত্মার পরিত্রাণ ও পরিশুদ্ধি খোঁজার সুযোগ দেয়। এই রহমত বিভিন্ন হাদিসের মাধ্যমে মহানবী হযরত মুহাম্মদ (সা.)-এর শিক্ষায় সুন্দরভাবে নিহিত রয়েছে।

নবী মুহাম্মাদ (সাঃ) বলেছেন, "যে ব্যক্তি ঈমানের সাথে এবং সওয়াবের আশায় রমজানের রোজা রাখবে, তার পূর্বের সকল গুনাহ মাফ করে দেওয়া হবে।" (আবু হুরায়রা থেকে বর্ণিত, সহীহ বুখারী)।

এই হাদিসটি রমজান মাসে আন্তরিকভাবে রোজা রাখার সাথে যে গভীর ক্ষমার বিষয়টি তুলে ধরে। এটি আল্লাহর কাছে ক্ষমা চাওয়ার ক্ষেত্রে বিশ্বাস ও ইচ্ছাকৃততার গুরুত্ব তুলে ধরে।

অধিকন্তু, রাসুলুল্লাহ (সা.) রমজান মাসে নামাজ ও নেক আমলের গুরুত্বের ওপর জোর দিয়েছেন। তিনি বলেন, দৈনিক পাঁচ ওয়াক্ত সালাত, এক জুমার নামায থেকে পরের সালাত পর্যন্ত এবং এক রমযান থেকে পরের রমযান পর্যন্ত মধ্যবর্তী গুনাহসমূহের

কাফফারা হয়ে যায়, যতক্ষণ না বড় গুনাহগুলো এড়ানো যায়। (আবু হুরায়রা থেকে বর্ণিত, সহীহ মুসলিম)।

এই হাদিসটি ব্যাখ্যা করে যে কীভাবে নিয়মিত নামাজ, জুমার নামাজ, এবং রমজানে রোজা পালন পাপের প্রায়শ্চিত্তের উপায় হিসাবে কাজ করে, একজন ব্যক্তিকে বড় ধরনের পাপ থেকে বিরত রাখে।

অধিকন্তু, নবী মুহাম্মদ (সাঃ) বলেছেন, "যে ব্যক্তি ঈমানের সাথে এবং সওয়াবের আশায় রমজানে নামাজে দাঁড়াবে, তার পূর্বের সমস্ত গুনাহ মাফ করে দেওয়া হবে।" (আবু হুরায়রা থেকে বর্ণিত, সহীহ বুখারী)।

এই বর্ণনাটি রমজানের রাতে তারাবীহ এবং দীর্ঘ তাহাজ্জুদের নামাযের মতো অতিরিক্ত প্রার্থনায় নিয়োজিত হওয়ার তাৎপর্যকে দৃঢ় করে, আন্তরিক বিশ্বাস এবং পুরস্কারের প্রত্যাশায়।

রাসুলুল্লাহ (সা.) লায়লাতুল কদর (কদরের রাত) অন্বেষণের গুরুত্বের ওপরও জোর দিয়ে বলেছেন, " যে ব্যক্তি ঈমানের সাথে এবং সওয়াবের আশায় শবে কদরের রাতে নামাজে দাঁড়াবে, তার পূর্ববর্তী সমস্ত পাপ ক্ষমা করা হবে।" (আবু হুরায়রা থেকে বর্ণিত, সহীহ বুখারী)।

লাইলাতুল কদর, যেমনটি কুরআনে বর্ণিত হয়েছে, অশেষ রহমতের একটি রাত, যেখানে আন্তরিক ইবাদত অতীতের পাপ ক্ষমার দিকে নিয়ে যেতে পারে।

জাবির ইবনে সামুরাহ কর্তৃক বর্ণিত একটি মর্মস্পর্শী হাদিস, নবী মুহাম্মদ (সা.) রমজানকে অবহেলা করার পরিণতি সম্পর্কে আমাদের জন্য একটি গভীর অনুস্মারক

রিলে করেছেন। তিনি বলেন, জিবরাঈল আমার কাছে এসে বললেন, 'যে ব্যক্তি রমজানে পৌঁছায় এবং তার গুনাহ মাফ না করে জাহান্নামে প্রবেশ করে, আল্লাহ তাকে দূর করুন! আমীন বলুন।' তাই আমি বললাম, 'যে ব্যক্তি তার পিতা-মাতা এবং তাদের একজনের প্রার্থনা প্রত্যক্ষ করে এবং এর ফলে জান্নাত লাভ করে না, আল্লাহ তাকে আমীন বলুন।' তাই আমি বললাম আমিন।
এই শক্তিশালী হাদিসটি একটি জেগে ওঠার আহ্বান হিসাবে কাজ করে, এবং ক্ষমার জন্য রমজানের সুযোগটি কাজে লাগাতে আহ্বান জানায়, যাতে পরকালে অনুশোচনার সম্মুখীন না হয়।

উপরন্তু, ফেরেশতারা রমজানে আমাদের জন্য তাদের ক্ষমা প্রার্থনা করে। হাদিসে উল্লেখ করা হয়েছে যে যারা রোজাদার তাদের জন্য ফেরেশতারা তাদের রোজা ভাঙ্গার আগ পর্যন্ত দোয়া করবেন।

আবদুল্লাহ বিন আমরের বর্ণনায়, নবী মুহাম্মাদ (সা.) কেয়ামতের দিন একজন মুমিনের জন্য রোজা এবং কুরআনের গভীর সুপারিশ ব্যাখ্যা করেছেন: "রোজা এবং কুরআন বিচারের দিন বান্দার জন্য সুপারিশ করবে। রোজা বলবে, 'হে প্রভু, আমি তাকে দিনের বেলায় খাবার ও কামনা-বাসনা থেকে বিরত রেখেছিলাম, তাই আমাকে তার জন্য সুপারিশ করার অনুমতি দিন।' এবং কুরআন বলবে, 'আমি তাকে রাতে ঘুম থেকে বিরত রেখেছিলাম, তাই আমাকে তার জন্য সুপারিশ করার অনুমতি দিন।' সুতরাং, তারা সুপারিশ করবে।"

এই হাদিসটি সুন্দরভাবে রোজা রাখার গতিশীল ভূমিকা এবং রমজান মাসে কুরআনের মাস বিষয়টি তুলে ধরা হয়েছে। রমজান একটি রহমতের মাস হিসেবে ক্ষমা চাওয়ার এবং ভাল কাজের মাধ্যমে আল্লাহর নৈকট্য লাভের জন্য সুবর্ণ সুযোগ।

কোরআন নাজিলের মহিমায় মহিমান্বিত মাস রমজান

কোরআন শব্দটি আরবি ‘করউন’ শব্দ থেকে নির্গত । করউন মানে হলো পড়া। আর কোরআন হলো এমন এক ঐশীগ্রন্থ, যা বারবার পড়া ও এর আদেশ-নিষেধ মান্য করা হয়। বারবার পড়া থেকে এটাকে কোরআন বলা হয়। (তাফসিরে বায়জাবি)। মানবতার মুক্তি ও কল্যাণের জন্য আল্লাহ তাআলা একটি অতুলনীয় গ্রন্থ দিয়েছেন। যার নাম কোরআন। পবিত্র কোরআন ছাড়াও আল্লাহ তাআলা যুগে যুগে আরও ছোট-বড় অনেক কিতাব নাজিল করেছেন। এর মধ্যে সর্বশেষ ও সর্বশ্রেষ্ঠ আসমানি গ্রন্থ কোরআন।

রমজান হিজরি বছরের নবম মাস। রমজান শব্দের অর্থ প্রচণ্ড গরম, সূর্যের খরতাপে পাথর উত্তপ্ত হওয়া, সূর্যতাপে উত্তপ্ত বালু বা মরুভূমি, মাটির তাপে পায়ে ফোসকা পড়ে যাওয়া, পুড়ে যাওয়া, ঝলসে যাওয়া, কাবাব বানানো, ঘাম ঝরানো, চর্বি গলানো, জ্বর, তাপ ইত্যাদি। রমজানজুড়ে ক্ষুধা-তৃষ্ণায় রোজাদার যে আমল করে, তা আগে কৃত সব পাপকে পুড়িয়ে ছাই করে দেয়। রোজাদার নিষ্পাপ হয়ে যায়। তাই এ মাসের নাম রমজান। (লিসানুল আরব)

এ মাসেই আল্লাহ তাআলা তাঁর অবারিত রহমত মহিমান্বিত আল কোরআন নাজিল করেছেন। আল্লাহ তাআলা বলেন-

شَهْرُ رَمَضَانَ الَّذِیْۤ اُنْزِلَ فِیْهِ الْقُرْاٰنُ هُدًى لِّلنَّاسِ وَ بَیِّنٰتٍ مِّنَ الْهُدٰى وَ الْفُرْقَانِ

‘রমজান মাস, যে মাসে নাজিল করা হয়েছে আল কোরআন; মানুষের জন্য হিদায়াতরূপে এবং পথনির্দেশনার প্রমাণ ও সত্য-মিথ্যা পার্থক্য নির্ণয়কারী হিসেবে।’ (সুরা বাকারা: আয়াত ২৮৫)।

রমজান মাসের গুরুত্ব, মর্যাদা এবং এ মাসে কোরআন নাজিল হওয়ার কথাও ঘোষণা করেন মহান আল্লাহ। অন্য সব মাসের ওপর রমজান মাসের সম্মান ও মর্যাদার বর্ণনা দিচ্ছেন যে, এ পবিত্র মাসেই কোরআনুল কারিম অবতীর্ণ হয়েছে। রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেন, 'ইবরাহিম আলাইহিস সালামের ওপর সহিফা রমজানের প্রথম রাতে, তাওরাত রমজানের ছয় তারিখে, ইনজিল রমজানের তেরো তারিখে এবং কোরআনুল কারিম রমজানের চব্বিশ তারিখে অবতীর্ণ হয়।' (মুসনাদে আহমাদ ৪/১০৭)।

ইসলামি থিওলজি অনুযায়ী, রমজান মাসে মহাগ্রন্থ আল কোরআন লওহে মাহফুজ থেকে দুনিয়ার আসমান বাইতুল ইজ্জতে নাজিল হয়। ফলে কোরআন নাজিলের মহিমায় মহিমান্বিত মাস রমজান। রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম জিবরিল আলাইহিস সালামের সঙ্গে এ মাসে কোরআন পুনরাবৃত্তি করতেন। উম্মাহকে কোরআনের ছায়াতলে জীবন কাটাতে আহ্বান করতেন। কোরআন নিয়ে চিন্তা-গবেষণা করতেন। আল্লাহ তাআলা বলেন-

كِتٰبٌ اَنۡزَلۡنٰهُ اِلَيۡکَ مُبٰرَکٌ لِّيَدَّبَّرُوۡۤا اٰيٰتِهٖ وَ لِيَتَذَکَّرَ اُولُوا الۡاَلۡبَابِ

'আমি এ মোবারক গ্রন্থটি আপনার ওপর নাজিল করেছি। যাতে মানুষ এর আয়াতসমূহের ব্যাপারে চিন্তা-গবেষণা করতে পারে এবং জ্ঞানবান লোকেরা এর দ্বারা উপদেশ গ্রহণ করতে পারে।' (সুরা সোয়াদ: আয়াত ২৯)।

কোরআনের কারণে বেড়ে গেছে রমজানের মর্যাদা। রমজানে যে ব্যক্তি একটি হরফ তেলাওয়াত করবে, সে ৭০টি হরফ তেলাওয়াতের সওয়াব পাবে। রোজা ও কোরআনের মধ্যে এক নিবিড় সম্পর্ক বিদ্যমান। রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেন, রোজা ও কোরআন বান্দার জন্য সুপারিশ করবে। রোজা বলবে, হে আল্লাহ! আমি তাকে দিনের বেলায় পানাহার থেকে বিরত রেখেছি।' কোরআন বলবে, 'হে

পরওয়ারদেগার! তাকে আমি রাতের বেলায় নিদ্রা থেকে বিরত রেখেছি। কাজেই তুমি আমার সুপারিশ কবুল করো।' এমতাবস্থায় আল্লাহ উভয়ের সুপারিশ কবুল করবেন।' (মুসনাদে আহমদ ৬৫৮৯)।

সর্বোপরি কোরআন মানবজাতির হেদায়াতের আলোকবর্তিকা। কোরআনের মাধ্যমে আল্লাহ ও বান্দার সঙ্গে সম্পর্ক সমাদৃত। এ কোরআনকে যারা ধারণ করেছে, তারা দামি হয়েছে; যেমন মর্যাদাবান এ মাস। তাইতো বিখ্যাত মুফাসসির সাহাবি হজরত আবদুল্লাহ ইবনে আব্বাস রাদিয়াল্লাহু আনহু বলেন, যে ব্যক্তি কোরআন তেলাওয়াত করবে, কোরআনের বিধান অনুযায়ী চলবে, আল্লাহ তাআলা তাকে সব ভ্রষ্টতা থেকে রক্ষা করবেন। কেয়ামতের ভয়ঙ্কর পরিস্থিতি থেকে হেফাজত করবেন। তার প্রমাণ আল্লাহ তাআলার এ বাণী- 'যে আমার হেদায়াতের অনুসরণ করবে, সে বিপথগামী হবে না; দুঃখগ্রস্ত হবে না।' (তাফসিরে তাবারি : ১৮/৩৮৯)।

কোরআন এক অলৌকিক গ্রন্থ, যা মানবজাতির পথনির্দেশক হিসেবে প্রেরিত হয়েছে। কোরআন আল্লাহর বাণী, যা রাসুলুল্লাহ (সা.)-এর ওপর অবতীর্ণ হয়ে গ্রন্থাকারে লিপিবদ্ধ আছে এবং রাসুলুল্লাহ (সা.) থেকে সন্দেহাতীতভাবে ক্রমান্বয়ে ধারাবাহিকভাবে বর্ণিত হয়েছে। রমজান মাসে কোরআন অবতরণের সূত্রেই রমজান কোরআনের মাস হিসেবে বিবেচিত।

কোরআন অবতরণের মাস : মানবজাতির হিদায়াতের জন্য আল্লাহ তাআলার প্রেরিত সর্বশেষ ও সর্বশ্রেষ্ঠ গ্রন্থ কোরআন মাজিদ রমজান মাসে অবতীর্ণ হয়েছে। কোরআন অবতরণের সূত্র ধরেই রমজান মাস শ্রেষ্ঠ মাস হিসেবে স্বীকৃতি পেয়েছে। আল্লাহ বলেন, 'রমজান মাস, এতে মানুষের দিশারি এবং সৎ পথের স্পষ্ট নিদর্শন ও সত্যাসত্যের পার্থক্যকারীরূপে কোরআন অবতীর্ণ হয়েছে।' (সুরা : বাকারা, আয়াত : ১৮৫)।

কোরআন অবতরণের সূচনা: রমজান মাসের কদরের রাতে নবী (সা.)-এর প্রতি কোরআন অবতরণের ধারাবাহিকতা শুরু হয়ে যা সুদীর্ঘ ২৩ বছরে পরিপূর্ণ হয়েছে। শুরুটা মহিমান্বিত কদরের রাতে হওয়ার কারণে আল্লাহ বলেন, 'নিঃসন্দেহে কদরের (রমজানের এক বিশেষ) রাতে আমি কোরআন অবতীর্ণ করেছি।' (সুরা : কদর, আয়াত : ১)।

হেরা গুহায় প্রথম ওহি : রাসুলুল্লাহ (সা.) রবিউল আউয়াল মাসের ৮ তারিখ মতান্তরে ১২ তারিখ (৫৭০ খ্রিস্টাব্দের এপ্রিল মাস) সোমবারে জন্মগ্রহণ করেন। (সিরাতুল মুস্তফা, ১ম খণ্ড, পৃ. ৫১) রবিউল আউয়াল মাসে জন্ম হিসেবে ৪০ বছর পর রবিউল আউয়াল মাসেই নবী (সা.)-এর বয়স ৪০ বছর পূর্ণ হয়। তখন থেকে তিনি বিভিন্ন সত্য স্বপ্ন দেখতে শুরু করেন। ক্রমান্বয়ে তাঁর কাছে একাকিত্ব আকর্ষণীয় হয়ে উঠলে তিনি হেরা গুহায় ধ্যানমগ্ন থাকতে শুরু করেন। মাঝেমধ্যে বাড়িতে এসে খাদ্য-পাথেয় নিয়ে যেতেন। এভাবে ছয় মাস অতিক্রম হওয়ার পর অর্থাৎ রবিউল আউয়াল মাসের পর (১) রবিউস সানি, (২) জুমাদাল উলা, (৩) জুমাদাল উখরা, (৪) রজব, (৫) শাবান, (৬) রমজান মাসে তাঁর প্রতি কোরআন অবতীর্ণ হওয়া শুরু হয়। প্রথমে সুরা আলাকের শুরুতে পাঁচটি আয়াত অবতীর্ণ হয়। (বুখারি, হাদিস : ৩; মুসলিম, হাদিস : ৪৪২)

পুরো কোরআন প্রথম আসমানে স্থানান্তর: আল্লাহ তাআলা কোরআন মাজিদকে রমজান মাসের কদরের রাতে লাওহে মাহফুজ থেকে প্রথম আসমানে বাইতুল ইজজাতে স্থানান্তর করেন। কোরআন মাজিদ লাওহে মাহফুজে সংরক্ষিত রয়েছে। আল্লাহ বলেন, 'বরং এটি মহান কোরআন, লাওহে মাহফুজে সংরক্ষিত।' (সুরা : বুরুজ, আয়াত : ২১-২২)।

রমজান মাসে কদরের রাতে আল্লাহ তাআলা কোরআন মাজিদকে সেখান থেকে প্রথম আসমানে বাইতুল ইজজাতে নিয়ে রেখেছেন। সেখান থেকে প্রয়োজন অনুযায়ী ২৩ বছরে নবী (সা.)-এর ওপর অবতীর্ণ হয়েছে। ইবনে আব্বাস (রা.) বলেন, নিশ্চয় আল্লাহ তাআলা কদরের রাতে কোরআন মাজিদ পুরোটাই লাওহে মাহফুজ থেকে প্রথম আসমানে বাইতুল ইজজাতে অবতীর্ণ করেছেন। অতঃপর প্রয়োজন অনুযায়ী ২৩ বছর ধরে রাসুলুল্লাহ (সা.)-এর ওপর অবতীর্ণ হয়েছে। (ইবনে কাসির, ৮ম খণ্ড, পৃ. ৪৪১; তাফসিরে কুরতুবি, ২০তম খণ্ড, পৃ. ১২৯)।

রোজা ও কোরআনের সুপারিশ: রোজা রোজাদারের জন্য আর কোরআন তার পাঠকারীর জন্য কিয়ামতের দিন আল্লাহর কাছে সুপারিশ করবে। আল্লাহ তাদের সুপারিশ কবুল করবেন। আবদুল্লাহ ইবনে আমর (রা.) থেকে বর্ণিত, রাসুলুল্লাহ (সা.) বলেন, 'রোজা ও কোরআন কিয়ামতের দিন মানুষের জন্য সুপারিশ করবে, রোজা বলবে, হে প্রতিপালক! আমি দিনের বেলা তাকে পানাহার ও সহবাস থেকে বিরত রেখেছি। তাই তার ব্যাপারে তুমি আমার সুপারিশ কবুল করো। কোরআন বলবে, আমি তাকে রাতে নিদ্রা থেকে বিরত রেখেছি। তাই তার ব্যাপারে তুমি আমার সুপারিশ কবুল করো।' রাসুলুল্লাহ (সা.) বলেন, 'অতঃপর উভয়ের সুপারিশই কবুল করা হবে।' (মুসনাদে আহমাদ, হাদিস : ৬৬২৬)।

রমজানে রাসুলুল্লাহ (সা.)-এর কোরআন তিলাওয়াত : রাসুলুল্লাহ (সা.) সারা বছর রাত জেগে নামাজ আদায় করতেন এবং দীর্ঘক্ষণ দাঁড়িয়ে কোরআন তিলাওয়াত করতেন। এতে তাঁর পা ফুলে যেত। আল্লাহ বলেন, 'আপনাকে কষ্ট-ক্লেশ দেওয়ার জন্য আমি আপনার প্রতি কোরআন অবতীর্ণ করিনি।' (সুরা : ত্ব-হা, আয়াত : ২)।

এর পর থেকে রাসুলুল্লাহ (সা.) রাতের অর্ধেক বা এক-তৃতীয়াংশে নামাজ ও তিলাওয়াত করতেন। রমজানে তাঁর তিলাওয়াতের মাত্রা আরো বেড়ে যেত। তিনি জিবরাইল (আ.)-

এর সঙ্গে সারা বছর অবতীর্ণ হওয়া কোরআনের অংশগুলো পুনরাবৃত্তি করতেন। ইবনে আব্বাস (রা.) থেকে বর্ণিত, ‘রমজানের প্রতি রাতে জিবরাইল (আ.) তাঁর সঙ্গে সাক্ষাৎ করতেন। রাসুল (সা.) জিবরাইল (আ.)-এর সঙ্গে কোরআন পুনরাবৃত্তি করতেন।’ (বুখারি, হাদিস : ৬; মুসলিম, হাদিস : ৬১৪৯)।

রমজানে আমাদের কাম্য : কোরআনের সঙ্গে রমজানের নিবিড় সম্পর্কের কারণে এই বরকতময় মাসে পুণ্যবান মানুষেরা রোজা রাখার মহান হুকুম পালনের সঙ্গে সঙ্গে অন্য নফল ইবাদতের মধ্যে কোরআন তিলাওয়াতকে বেশি গুরুত্ব দিতেন। রমজানের পুরো মাসকে পবিত্র কোরআনের জন্য ওয়াক্ফ করে দিতেন। তাঁদের কেউ কেউ সাধ্যানুযায়ী অধিকবার কোরআন খতমের প্রতি মনোনিবেশ করতেন। আবার অনেকের মনোযোগ থাকত কোরআনের গভীরে গিয়ে নিগূঢ় তথ্য ও রহস্যগুলো উদঘাটন করে তার মুক্তামালায় জীবনকে সাজিয়ে নেওয়া। এই পবিত্র মাসে আমাদের কাম্য হলো—

১. সহিহ-শুদ্ধভাবে কোরআন পড়তে না জানলে এই রমজানেই কোরআন শেখার দৃঢ়সংকল্প নিয়ে সর্বাত্মক প্রচেষ্টা শুরু করা।

২. কোরআন পড়তে জানলে একাধিক খতম হওয়ার মতো বেশি করে তিলাওয়াতের অভ্যাস গড়ে তোলা।

৩. কোরআন তিলাওয়াতের পাশাপাশি কোরআনের মর্মবাণী বোঝার জন্য তাফসির ও হাদিস অধ্যয়নসহ হক্কানি আলেমদের সাহচর্য লাভ করা।

৪. কোরআনের নির্দেশনা অনুযায়ী সুন্নাহমাফিক আমল করে কোরআনের সঙ্গে সুমধুর সম্পর্ক গড়ে তোলা।

৫. তারাবির নামাজে কোরআন শুনে খতম করা।

৬. রমজান মাসে গড়ে তোলা অভ্যাস বছরজুড়ে চালু রাখা।

পরিশেষে বলা যায়, কোরআনের মাসে কোরআনের সঙ্গে সম্পর্ক তৈরি হোক, এটাই হওয়া উচিত সবার প্রচেষ্টা ও প্রত্যয়। এতেই পূর্ণতা পাবে রমজানের আবেদন। মহান আল্লাহ সবাইকে তাওফিক দান করুন।

রোজা রাখার ১৫টি ফজিলতঃ

রোজা রাখার অসংখ্য ফজিলত কুরআন ও হাদিসে বর্ণিত হয়েছে। এখানে ১৫টি ফজিলত তুলে ধরা হলো-

১. রোজার প্রতিদান স্বয়ং আল্লাহ তাআলা নিজে দেবেন। আল্লাহ তাআলা বলেন, বান্দা একমাত্র আমার জন্য তার পানাহার ও কামাচার বর্জন করে । রোজা আমার জন্যই, আমি নিজেই এর পুরস্কার দেব । (বুখারি, হাদিস : ১৮৯৪)।

২.আল্লাহ তাআলা নিজের ওপর অবধারিত করে নিয়েছেন, যে ব্যক্তি তাঁর সন্তুষ্টির জন্য গ্রীষ্মকালে (রোজার কারণে) পিপাসার্ত থেকেছে, তিনি তাকে তৃষ্ণার দিন (কেয়ামতের দিন) পানি পান করাবেন। (মুসনাদে বাযযার, হাদিস : ১০৩৯)।

৩. কেয়ামতের দিন রোজাদারদের জন্য একটি বিশেষ পানির হাউজ থাকবে, যেখানে রোজাদার ব্যতিত অন্য কারো আগমন ঘটবে না। (মুসনাদে বাযযার, হাদিস : ৮১১৫)।

৪. যে ব্যক্তি আল্লাহর সন্তুষ্টি কামনায় একদিন রোজা রাখবে, পরে তার মৃত্যু হলে সে জান্নাতে প্রবেশ করবে। (মুসনাদে আহমাদ, হাদিস : ২৩৩২৪)।

৫. জান্নাতে একটি স্পেশাল ফটক রয়েছে। যার নাম রাইয়ান। সেই গেইট দিয়ে কেবল রোজাদারগণই প্রবেশ করতে পারবে । (বুখারি, হাদিস : ১৮৯৬)।

৬. রোজাদারগণ রাইয়ান নামক গেইট দিয়ে প্রবেশ করে জান্নাতের পানীয় পান করবে। তারপর থেকে আর কখনো তাঁরা পিপাসার্ত হবে না। (তিরমিজি, হাদিস : ৭৬৫)।

৭. রোজা জাহান্নাম থেকে রক্ষাকারী ঢাল। আল্লাহ তাআলা বলেন, রোজা হলো ঢাল। বান্দা এর দ্বারা নিজেকে জাহান্নামের আগুন থেকে রক্ষা করবে। (মুসনাদে আহমাদ, হাদিস : ১৪৬৬৯)।

৮. রোজা কিয়ামতের দিন বান্দার জন্য সুপারিশ করবে। রোজা বলবে, হে রব! আমি তাকে খাদ্য ও যৌন সম্ভোগ থেকে বিরত রেখেছি। অতএব তার ব্যাপারে আমার সুপারিশ গ্রহণ করুন। রাসূলুল্লাহ সা: বলেন, অতঃপর তার সুপারিশ গ্রহণ করা হবে। (মুসনাদে আহমাদ, হাদিস : ৬৬২৬)।

৯. ঈমানের সাথে সওয়াবের আশায় রমজানের রোজা রাখলে পূর্ববর্তী গুনাহসমূহ ক্ষমা করে দেয়া হবে। (বুখারি, হাদিস : ৩৮)।

১০. ঈমানের সাথে সওয়াবের আশায় রমজানের রোজা রাখলে ও তারাবি পড়লে ওই দিনের মতো নিষ্পাপ হয়ে যাবে যেদিন সে মায়ের গর্ভ থেকে ভূমিষ্ঠ হয়েছিল। (নাসাঈ, হাদিস : ২৫১৮)।

১১. রোজাদারের মুখের দুর্গন্ধ আল্লাহর কাছে মেশকের সুগন্ধির চেয়েও অধিক সুগন্ধময়। (বুখারি, হাদিস : ১৯০৪)।

১২. রোজাদারের জন্য স্পেশাল দুটি আনন্দের মুহূর্ত রয়েছে; এক. যখন সে ইফতার করে তখন ইফতারের কারণে আনন্দ পায়। দুই. যখন সে তার রবের সাথে মিলিত

হবে তখন তার রোজার (পুরস্কার লাভের) কারণে আনন্দিত হবে। (বুখারি, হাদিস : ১৯০৪)।

১৩. রোজাদারগণ পরকালে সিদ্দীকীন ও শহীদগণের দলভুক্ত হবে। (সহিহ ইবনে হিব্বান, হাদিস : ৩৪২৯)।

১৪. ইফতারের সময় রোজাদার যদি দুআ করে, তাহলে তার দুআ ফিরিয়ে দেয়া হয় না। (অর্থাৎ তার দুআ কবুল হয়)। (ইবনে মাজাহ, হাদিস : ১৭৫৩)।

১৫. রোজা অন্তরের হিংসা-বিদ্বেষ দূর করে দেয়। (মুসনাদে আহমাদ, হাদিস : ২৩০৭০)।

রোজা রাখার সওয়াব এবং না রাখার শাস্তিঃ

রোজা রাখার সওয়াবঃ

রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন, ‘আদম সন্তানের প্রতিটি কাজই দশগুণ থেকে সাতশত গুণ বৃদ্ধি করা হয়। মহান আল্লাহ তাআলা বলেন, কিন্তু রোজা ছাড়া। কেননা তা আমার জন্য, তাই আমি এর প্রতিদান দেবো। সে আমার সন্তুষ্টির জন্য কামাচার ও পানাহার পরিত্যাগ করে। রোজা পালনকারীর জন্য রয়েছে দুটি খুশী যা তাঁকে খুশী করে। যখন সে ইফতার করে, সে খুশী হয় এবং যখন সে তাঁর রবের সাথে সাক্ষাৎ করবে, তখন রোজার বিনিময়ে আনন্দিত হবে। রোজা পালনকারীর মুখের (না খাওয়াজনিত) ঘ্রাণ আল্লাহর কাছে মিসকের ঘ্রাণের চেয়েও উত্তম।’ (বুখারি ১৯০৪, মুসলিম ১১৫১)।

অন্য বর্ণনায় এসেছে,

لِكُلِّ عَمَلٍ كَفَّارَةٌ، وَالصَّوْمُ لِي وَأَنَا أَجْزِي بِهِ

‘প্রত্যেক আমলেরই কাফফারা আছে। রোজা আমার জন্য, তাই আমি এর প্রতিদান দেবো।’ (বুখারি ৭৫৩৮, মুসনাদে আহমাদ ১০৫৫৪)।

হাদিসের বর্ণনায় রোজাকে অন্যান্য আমলের বর্ধিত সওয়াব থেকে আলাদা করা হয়েছে। অন্যান্য আমলের সওয়াব দশ গুণ থেকে সাতশত গুণ করার কথা বলা হলেও রোজার ব্যাপারটি আলাদা। কেননা এর সওয়াব সীমাবদ্ধ নয়; বরং আল্লাহ তাআলা রোজার সওয়াব বহু গুণে দান করবেন। কেননা রোজা সবর তথা ধৈর্য থেকে এসেছে। আল্লাহ তাআলা বলেছেন-

إِنَّمَا يُوَفَّى ٱلصَّٰبِرُونَ أَجْرَهُم بِغَيْرِ حِسَابٍ

‘কেবল ধৈর্যশীলদেরকেই তাদের প্রতিদান পূর্ণরূপে দেওয়া হবে, কোনো হিসাব ছাড়াই।’ (সুরা যুমার: আয়াত ১০)।

ধৈর্য তিন ধরনের। এ তিন ধরণের ধৈর্য রোজার মধ্যে একত্রিত হয়। আল্লাহর আনুগত্যের ওপর ধৈর্যধারণ করা, আল্লাহর হারাম জিনিস থেকে বিরত থাকতে ধৈর্যধারণ করা এবং আল্লাহর ফয়সালাকৃত কষ্টের উপর ধৈর্যধারণ করা। এ কারণেই রাসুলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন:

وَهُوَ شَهْرُ الصَّبْرِ، وَالصَّبْرُ ثَوَابُهُ الْجَنَّةُ

‘রমযান মাস ধৈর্যের মাস। আর ধৈর্যের প্রতিদান জান্নাত।’ (ইবন খুযাইমা ১৮৮৭)।

হজরত আবু হুরায়রা রাদিয়াল্লাহু আনহু বর্ণনা করেছেন, রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন-

َالصِّيَامُ جُنَّةٌ، وَإِذَا كَانَ يَوْمُ صَوْمِ أَحَدِكُمْ فَلاَ يَرْفُثْ وَلاَ يَصْخَبْ، فَإِنْ سَابَّهُ أَحَدٌ أَوْ قَاتَلَهُ، فَلْيَقُلْ إِنِّي امْرُؤٌ صَائِمٌ

‘ রোজা ঢালস্বরূপ। তোমাদের কেউ যেন রোজা পালনের দিন অশ্লীলতায় লিপ্ত না হয় এবং ঝগড়া-বিবাদ না করে। কেউ যদি তাঁকে গালি দেয় অথবা তাঁর সঙ্গে ঝগড়া করে, তাহলে সে যেন বলে, আমি একজন রোজা পালনকারী।’ (বুখারি ১৯০৪, মুসলিম ১১৫১)।

হজরত আবু উবাইদাহ রাহমাতুল্লাহি আলাইহি বর্ণনা করেন-

الصَّوْمُ جُنَّةٌ مَا لَمْ يَخْرِقْهَا

‘রোজা ঢালস্বরুপ যতক্ষণ পর্যন্ত তা ভেঙ্গে না ফেলে।’ (নাসাঈ ২২৩৫, মুসনাদে আহমাদ ১৬৯০)।

হজরত আবু হুরায়রা রাদিয়াল্লাহু আনহু বর্ণনা করেছেন, রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন-

ثَلَاثَةٌ لَا تُرَدُّ دَعْوَتُهُمْ: الصَّائِمُ حَتَّى يُفْطِرَ

'তিন ব্যক্তির দোয়া ফিরিয়ে দেওয়া হয় না। রোজা পালনকারী যতক্ষণ না ইফতার করে।' (তিরমিজি ৩৪৯৮)।

রোজা পালনকারী যদি রাতে নামাজ আদায় করে এবং দিনের বেলায় রোজা পালনের উদ্দেশ্যে শরীরিক শক্তি বৃদ্ধির জন্য পানাহার করে তাহলে তা তার জন্য সাওয়াব হিসেবে ধর্তব্য হবে যেমনিভাবে সে রাতে ও দিনে কাজের জন্য শক্তি বৃদ্ধি করতে ঘুমালে সেটি তার জন্য ইবাদত হবে।

হজরত আবু আলিয়াহ রাহমাতুল্লাহি আলাইহি বলেছেন, রোজা পালনকারী গিবত না করা পর্যন্ত ইবাদতে থাকে, যদিও সে বিছানায় ঘুমায়। অতএব, রোজাদার রাত-দিন সব সময়ই ইবাদতে থাকে এবং রোজা অবস্থায় ও ইফতারির সময় তার দোয়া কবুল করা হয়। সে দিনের বেলায় রোজা পালনকারী ও ধৈর্যশীল এবং রাতের বেলায় আহার গ্রহণকারী ও আল্লাহর শুকরিয়া আদায়কারী। ইমাম তিরমিজি ও অন্যান্যরা বর্ণনা করেন-

الطَّاعِمُ الشَّاكِرُ بِمَنْزِلَةِ الصَّائِمِ الصَّابِرِ

'আল্লাহর শুকরিয়া আদায়কারী, আহারকারীর মর্যাদা হলো ধৈর্যশীল রোজা পালনকারীর মতো।' (তিরমিজি ২৪৮৬)।

যারা আল্লাহর সন্তুষ্টির জন্য পানাহার ও কামভাব ত্যাগ করেছে বিনিময়ে জান্নাত পাওয়ার আশায়। এ শ্রেণির লোকেরা আল্লাহর সঙ্গে ব্যবসা করেছে। আর যারা উত্তম কাজ করেন তাদের প্রতিদান আল্লাহ নষ্ট করেন না। যারা আল্লাহর সঙ্গে ব্যবসা করবে তারা বিফল হবে না, বরং তারা বিরাট লাভবান হবে। রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন-

إِنَّكَ لَنْ تَدَعَ شَيْئًا اتِّقَاءَ اللهِ إِلَّا أَعْطَاكَ اللهُ خَيْرًا مِنْه

'আল্লাহর তাকওয়ার উদ্দেশ্যে যা কিছুই তুমি পরিহার করো, তিনি তার চেয়ে উত্তম প্রতিদান দেবেন।' (মুসনাদে আহমাদ ২০৭৩৯)।

এসব রোজা পালনকারীকে জান্নাতে তাদের ইচ্ছামত খাদ্য, পানীয় ও নারী দান করা হবে। আল্লাহ তাআলা বলেছেন-

كُلُواْ وَٱشۡرَبُواْ هَنِيٓـَٔۢا بِمَآ أَسۡلَفۡتُمۡ فِي ٱلۡأَيَّامِ ٱلۡخَالِيَةِ

'(তাদেরকে বলা হবে) বিগত দিনসমূহে তোমরা যা আগে প্রেরণ করেছ তার বিনিময়ে তোমরা তৃপ্তি সহকারে খাও ও পান করো।' (সুরা হাক্কাহ: আয়াত ২৪)।

যে পাঁচটি স্তম্ভের ওপর ইসলামের বুনিয়াদ প্রতিষ্ঠিত তার মধ্যে রোজা একটি। রমজান মাসে প্রাপ্তবয়স্ক, সুস্থ বিবেক-বুদ্ধিসম্পন্ন ও মুকিম তথা নিজ বাড়িতে অবস্থানকারী প্রত্যেক মুসলমানের ওপর রোজা রাখা ফরজ। রোজার বিধান সম্পর্কে কুরআনুল কারিমে আল্লাহ তায়ালা বলেন, 'হে ঈমানদারগণ! তোমাদের ওপর সিয়াম ফরজ করা হয়েছে, যেমন ফরজ করা হয়েছিল তোমাদের পূর্ববর্তী লোকদের ওপর, যেন তোমরা তাকওয়া অর্জন করতে পারো' (সুরা বাকারা : ১৮৩)।

অন্য এক আয়াতে এসেছে, 'অতএব, তোমাদের মধ্যে যে ব্যক্তি এ মাস পাবে, সে যেন এ মাসে রোজা পালন করে। তবে কেউ রোগাক্রান্ত হলে অথবা সফরে থাকলে এ সংখ্যা অন্য সময়ে পূরণ করবে।' (সুরা বাকারা : ১৮৫)।

রমজান মাসে রোজার প্রতিদান বিষয়ে রাসুলুল্লাহ (সা.) বলেছেন, 'আদম সন্তানের প্রতিটি কাজই দশগুণ থেকে সাতশগুণ বৃদ্ধি করা হয়। মহান আল্লাহ তায়ালা বলেন,

কিন্তু রোজা ছাড়া। কেননা তা আমার জন্য, তাই আমি এর প্রতিদান দেব। সে আমার সন্তুষ্টির জন্য কামাচার ও পানাহার পরিত্যাগ করে। রোজা পালনকারীর জন্য রয়েছে দুটি সুসংবাদ যা তাকে খুশি করে। যখন সে ইফতার করে, সে খুশি হয় এবং যখন সে তার রবের সঙ্গে সাক্ষাৎ করবে, তখন রোজার বিনিময়ে আনন্দিত হবে। রোজা পালনকারীর মুখের (না খাওয়াজনিত) ঘ্রাণ আল্লাহর কাছে মিসকের ঘ্রাণের চেয়েও উত্তম' (বুখারি ১৯০৪)।

তিনি আরও বলেছেন, প্রত্যেক আমলেরই কাফফারা আছে। রোজা আমার জন্য, তাই আমি এর প্রতিদান দেব।' (বুখারি ৭৫৩৮)।

রোজার বিনিময়ে রয়েছে জান্নাত। রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, রমজান মাস ধৈর্যের মাস। আর ধৈর্যের প্রতিদান জান্নাত' (ইবন খুজাইমা ১৮৮৭)। আরেক হাদিসে এসেছে, রোজা ঢালস্বরূপ যতক্ষণ পর্যন্ত তা ভেঙে না ফেলে' (নাসাঈ ২২৩৫, মুসনাদে আহমাদ ১৬৯০)।

এখানেই শেষ নয়। রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আরও বলেছেন, রোজা পালনকারীর মুখের (না খাওয়াজনিত) ঘ্রাণ আল্লাহর কাছে মিসকের ঘ্রাণের চেয়েও উত্তম' (বুখারি ১৯০৪, সহিহ মুসলিম ১১৫১) ।

তিরমিজি শরিফে বর্ণনা করা হয়েছে, তিন ব্যক্তির দোয়া ফিরিয়ে দেওয়া হয় না। (তার মধ্যে একজন হলো) রোজা পালনকারী ব্যক্তি, যতক্ষণ না ইফতার করে।' (তিরমিজি ৩৪৯৮)।

রোজা না রাখার শাস্তিঃ

এই মাসে রোজা রাখলে যেমন অধিক সওয়াব লাভের সুযোগ রয়েছে, তদ্রুপ রোজা না রাখলেও রয়েছে ভয়াবহ শাস্তির আশঙ্কা। রমজান মাসে রোজা পরিত্যাগ করা কবিরা গুনাহ।

রমজান মাসে রোজা না রাখার ভয়াবহ শাস্তির ব্যাপারে হাদিসে এসেছে, রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, একবার আমি ঘুমিয়ে ছিলাম। এ সময় দুজন লোক এসে আমার দুই বাহু ধরে আমাকে দুর্গম পাহাড়ে নিয়ে যায়। অতঃপর আমাকে এমন কিছু লোকের কাছে নিয়ে যায়, যাদের পায়ের টাখনুতে বেঁধে ঝুলিয়ে রাখা হয়েছে। তাদের গাল ছিন্নভিন্ন, তা থেকে রক্ত প্রবাহিত হচ্ছে।' আমি জিজ্ঞেস করলাম, 'এরা কারা?' তারা বললেন, 'এরা এমন রোজাদার, যারা (অকারণে রমজান মাসের) রোজা শেষ না করেই ইফতার করত' (সহিহ ইবনে খুজাইমা, হাদিস : ১৫০৯)।

অপর হাদিসে হজরত আবু হুরায়রা (রা.) থেকে বর্ণিত, 'যে ব্যক্তি প্রয়োজন ও রোগ ছাড়া রমজানের একটি রোজা ভেঙে ফেলল, তার সারা জীবনের রোজা দ্বারাও এ কাজা আদায় হবে না, যদিও সে সারা জীবন রোজা পালন করে' (তিরমিজি : ৭২৩)।

যে ব্যক্তি অসুস্থতা ও সফর ব্যতীত ইচ্ছাকৃতভাবে রমযানের একটি রোযাও ভঙ্গ করে, সে আজীবন রোযা রাখলেও ঐ রোযার হক আদায় হবে না।-

মুসান্নাফে ইবনে আবী শাইবা, হাদীস : ৯৮৯৩; মুসান্নাফে আব্দুর রাযযাক, হাদীস : ৭৪৭৬; সহীহ বুখারী ৪/১৬০।

হযরত আলী রা. বলেন-

من افطر يوما من رضمان متعمدا لم يقضه أبدا طول الدهر.

যে ব্যক্তি ইচ্ছাকৃতভাবে রমযান মাসের একটি রোযা ভঙ্গ করবে, সে আজীবন সেই রোযার (ক্ষতিপূরণ) আদায় করতে পারবে না।- মুসান্নাফে ইবনে আবী শাইবা, হাদীস : ৯৮৭৮।

আল্লাহ তায়ালা আমাদের সবাইকে রোজার গুরুত্ব ও ফযীলত বুঝার ও রাখার তওফিক দান করুন।

রমজান মাসের গুরুত্বপূর্ণ ৩০ টি আমলঃ

রমাদান মাস আল্লাহ তা'আলা এক বিশেষ নিয়ামাত। সাওয়াব অর্জন করার মৌসুম। এ মাসেই কুরআন অবতীর্ণ হয়েছে, রহমাত, বরকত ও নাজাতের মাস-রমাদান মাস। আলকুরআনে এসেছে: "রমাদান মাস, যার মধ্যে কুরআন নাযিল করা হয়েছে লোকদের পথ প্রদর্শক এবং হিদায়াতের সুস্পষ্ট বর্ণনারূপে এবং সত্য-মিথ্যার পার্থক্যকারীরূপে" [সূরা আলবাকারাহ : ১৮৫]।

রমাদান মাসের ফযিলাত সম্পর্কে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন: "রমাদান- বরকতময় মাস তোমাদের দুয়ারে উপস্থিত হয়েছে। পুরো মাস রোযা পালন আল্লাহ তোমাদের জন্য ফরয করেছেন। এ মাসে জান্নাতের দরজা উন্মুক্ত করে দেয়া হয়, বন্ধ করে দেয়া হয় জাহান্নামের দরজাগুলো। দুষ্ট শয়তানদের এ মাসে শৃংখলাবদ্ধ করে দেয়া হয়। এ মাসে আল্লাহ কর্তৃক একটি রাত প্রদত্ত হয়েছে, যা হাজার মাস থেকে উত্তম। যে এর কল্যাণ থেকে বঞ্চিত হল, সে বঞ্চিত হল (মহা কল্যাণ হতে)" [সুনান আত-তিরমিযি: ৬৮৩]।

এ মাসে বেশ কিছু গুরুত্বপূর্ণ আমল রয়েছে, যেগুলো পালন করার মাধ্যমে আমরা জান্নাতে যেতে পারি, জাহান্নাম থেকে মুক্তি পেতে পারি। নিম্নে রমাদান মাসের আমল সম্পর্কে আলোচনা করা হলো।

তবে এ আমলগুলো করার জন্য শর্ত হলো:

এক:- ইখলাস অর্থাৎ "একনিষ্ঠতার সাথে একমাত্র আল্লাহ তা'আলার জন্যে আমল করা। সুতরাং যে আমল হবে টাকা উপার্জনের জন্য, নেতৃত্ব অর্জনের জন্য ও সুনাম-খ্যাতি অর্জনের জন্যে সে আমলে ইখলাস থাকবে না অর্থাৎ এসব ইবাদাত বা নেক আমলের মাধ্যমে আল্লাহর সন্তুষ্টি অর্জিত হবে না বরং তা ছোট শির্কে রূপান্তরিত হতে পারে। আল-কুরআনে এসেছে: "আর তাদেরকে কেবল এই নির্দেশ দেয়া হয়েছিল যে, তারা যেন আল্লাহর 'ইবাদাত করে তাঁরই জন্য দীনকে একনিষ্ঠ করে" [সূরা আল-বাইয়্যেনাহ : ৫]।

দুই:- ইবাদাতের ক্ষেত্রে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের অনুসরণ। সহীহ হাদীসে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের যে সকল ইবাদাতের কথা উল্লেখ আছে সেগুলো পরিপূর্ণ অনুসরণ করতে হবে। এ ক্ষেত্রে কোনো বাড়ানো বা কমানোর সুযোগ নেই। কারণ, ইবাদাত হচ্ছে তাই যা রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম শিখিয়ে দিয়েছেন। কুরআনে এসেছে:'এবং রাসূল তোমাদের জন্য যা নিয়ে এসেছেন তা তোমরা গ্রহণ কর, আর যা থেকে সে তোমাদের নিষেধ করে তা থেকে বিরত হও' [সূরা হাশর: ৭]।

এ বিষয়ে রাসূল সাল্লালাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন: "যে এমন ইবাদত করল যাতে আমাদের কোন নির্দেশনা নেই তা পরিত্যাজ্য হিসাবে গণ্য হবে"। [সহীহ মুসলিম : ৪৫৯০]।

রমাদান মাসের গুরুত্বপূর্ণ আমলগুলো হলো:-

১.**সিয়াম পালন করা:** ইসলামের পাঁচটি রুকনের একটি রুকন হল সিয়াম। আর রমাদান মাসে সিয়াম পালন করা ফরজ। সেজন্য রমাদান মাসের প্রধান আমল হলো সুন্নাহ মোতাবেক সিয়াম পালন করা। মহান আল্লাহ বলেন: "সুতরাং তোমাদের মধ্যে যে, মাসটিতে উপস্থিত হবে, সে যেন তাতে সিয়াম পালন করে" [সূরা আল-বাকারাহ : ১৮৫]।

সিয়াম পালনের ফযিলাত সম্পর্কে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন: "যে ব্যক্তি ঈমানের সাথে ইখলাস নিয়ে অর্থাৎ একনিষ্ঠভাবে আল্লাহকে সন্তুষ্টি করার জন্য রমাদানে সিয়াম পালন করবে, তার অতীতের সব গুনাহ মাফ করে দেয়া হবে" [সহীহ বুখারী : ২০১৪]।

"যে কেউ আল্লাহর রাস্তায় (অর্থাৎ শুধুমাত্র আল্লাহকে খুশী করার জন্য) একদিন সিয়াম পালন করবে, তাদ্বারা আল্লাহ তাকে জাহান্নামের অগ্নি থেকে সত্তর বছরের রাস্তা পরিমাণ দূরবর্তীস্থানে রাখবেন"। [সহীহ মুসলিম : ২৭৬৭]।

২. **সময় মত সালাত আদায় করা:** সিয়াম পালনের সাথে সাথে সময় মত নামায আদায় করার মাধ্যমে জান্নাতে যাওয়ার পথ সুগম হয়। কুরআন মাজীদে বলা হয়েছে: 'নিশ্চয় সালাত মুমিনদের উপর নির্দিষ্ট সময়ে ফরয।' [সূরা নিসা : ১০৩]

এ বিষয়ে হাদীসে এসেছে:আব্দুল্লাহ ইবন মাসউদ রাদিয়াল্লাহু আনহু বলেন, আমি বললাম, হে আল্লাহর নবী! কোন আমল জান্নাতের অতি নিকটবর্তী? তিনি বললেন, সময় মত নামায আদায় করা। [সহীহ মুসলিম : ২৬৩]।

৩. **সহীহভাবে কুরআন শেখা:** রমাদান মাসে কুরআন অবতীর্ণ করা হয়েছে। এ মাসের অন্যতম আমল হলো সহীহভাবে কুরআন শেখা। আর কুরআন শিক্ষা করা ফরয করা হয়েছে। কেননা কুরআনে বলা হয়েছে:"পড় তোমার রবের নামে, যিনি সৃষ্টি করেছেন" [সূরা আলাক : ১]।

রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম কুরআন শেখার নির্দেশ দিয়ে বলেন:"তোমরা কুরআন শিক্ষা কর এবং তিলাওয়াত কর" [মুসনাদ আলজামি : ৯৮৯০]।

৪.**অপরকে কুরআন পড়া শেখানো:** রমাদান মাস অপরকে কুরআন শেখানোর উত্তম সময়। এ মাসে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম নিজে সাহাবীদেরকে কুরআন শিক্ষা দিতেন। এ বিষয়ে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন: "তোমাদের মধ্যে সর্বোত্তম ব্যক্তি সেই, যে নিজে কুরআন শিক্ষা করে ও অপরকে শিক্ষা দেয়" [সহীহ আল-বুখারী : ৫০২৭]।

'যে আল্লাহর কিতাব থেকে একটি আয়াত শিক্ষা দিবে, যত তিলাওয়াত হবে তার সাওয়াব সে পাবে' [সহীহ কুনুযুস সুন্নাহ আন-নবুবিয়্যাহ : ০৭]।

৫.**সাহরী খাওয়া:** সাহরী খাওয়ার মধ্যে বরকত রয়েছে এবং সিয়াম পালনে এটি একটি গুরুত্বপূর্ণ বিষয়। হাদীসে এসেছে: "সাহরী হল বরকতময় খাবার। তাই কখনো সাহরী খাওয়া বাদ দিয়ো না। এক ঢোক পানি পান করে হলেও সাহরী খেয়ে নাও। কেননা সাহরীর খাবার গ্রহণকারীকে আল্লাহ তা'আলা ও তাঁর ফেরেশতারা স্মরণ করে থাকেন" [মুসনাদ আহমাদ : ১১১০১, সহীহ]।

৬.**সালাতুত তারাবীহ পড়া:** সালাতুত তারাবীহ পড়া এ মাসের অন্যতম আমল। তারাবীহ পড়ার সময় তার হক আদায় করতে হবে। হাদীসে এসেছে: 'যে ব্যক্তি ঈমানের সাথে সাওয়াব হাসিলের আশায় রমাদানে কিয়ামু রমাদান (সালাতুত তারাবীহ) আদায় করবে, তার অতীতের সব গুনাহ মাফ করে দেয়া হবে' [সহীহ আল-বুখারী : ২০০৯]।

তারাবীহ এর সালাত তার হক আদায় করে অর্থাৎ ধীরস্থীরভাবে আদায় করতে হবে। তারাবীহ জামায়াতের সাথে আদায় করা সুন্নাহ এর অন্তর্ভুক্ত। হাদীসে আছে: "যে ব্যক্তি ইমামের সাথে প্রস্থান করা অবধি সালাত আদায় করবে (সালাতুত তারাবীহ) তাকে পুরো রাত কিয়ামুল লাইলের সাওয়াব দান করা হবে" [সুনান আবূ দাউদ : ১৩৭৭, সহীহ]।

রাদিয়াল্লাহু আনহুমা থেকে বর্ণিত হাদীসে রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন: "কুরআনের ধারক-বাহককে বলা হবে কুরআন পড়ে যাও, আর উপরে উঠতে থাক, ধীর-স্থিরভাবে তারতীলের সাথে পাঠ কর, যেমন দুনিয়াতে তারতীলের সাথে পাঠ করতে। কেননা জান্নাতে তোমার অবস্থান সেখানেই হবে, যেখানে তোমার আয়াত পড়া শেষ হবে" [সুনান আত-তিরমিযী : ২৯১৪]।

৭.**বেশি বেশি কোরআন তিলাওয়াত করা:** পবিত্র রমজান কোরআনুল কারিম নাজিলের মাস। এই মাস মহানগ্রন্থ আল কোরআন পড়া ও শেখারও মাস। সাধারণত কোরআন তেলাওয়াতে প্রতি হরফের বিনিময়ে ১০ নেকির ঘোষণা করা হয়েছে হাদিস শরিফে। আর রমজান মাসে সেই ১০ নেকির ওপর আরও ১০ গুন বৃদ্ধি থেকে শুরু করে আল্লাহ তায়ালা যত ইচ্ছা বরকত দান করবেন।

হাদিসে কুদসিতে এসেছে : “রোজা আমারই জন্য। এর পুরস্কার আমি নিজেই দেব। আর প্রত্যেক নেক কাজের বিনিময়ে দশগুণ বৃদ্ধি করব।” (বুখারী শরীফ, ইফা, হাদিস নং ১৭৭৩)।

৮.**বেশি বেশি শুকরিয়া আদায় করা:** মানব জীবনে পবিত্র মাহে রমজান মাস পাওয়া নিঃসন্দেহে এক মহাসৌভাগ্যের বিষয়। এ কারণে আল্লাহ সুবহানাহু ওয়াতাআলার বেশি বেশি শুকরিয়া আদায় করা উচিত। বেশি বেশি হামদ ও সানা পাঠ করে মহান মুনিবের নিকট কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করা।

পাশাপাশি আগামী রমজানের জন্য আল্লাহর নিকট তাওফিক প্রত্যাশা করা। এ বিষয়ক নির্দেশনা আল কোরআনেও এসেছে। আল্লাহ সুবহানাহু ওয়াতাআলা ইরশাদ করেন : ‘আর যাতে তোমরা সংখ্যা পূরণ কর এবং তিনি তোমাদেরকে যে হিদায়াত দিয়েছেন, তার জন্য আল্লাহর বড়ত্ব ঘোষণা কর এবং যাতে তোমরা শোকর কর।’ [সুরা আল বাকারাহ : ১৮৫]।

৯.**কল্যাণকর কাজে বেশি অংশগ্রহণ করা:** এ মাসটিতে একটি ভালো কাজ অন্য মাসের চেয়ে অনেক বেশি উত্তম। সে জন্য যথাসম্ভব বেশি বেশি ভালো কাজ করতে হবে।

আবু হুরায়রা (রা.) থেকে বর্ণিত, নবী (সা.) বলেছেন, এ মাসের প্রত্যেক রাতে একজন ঘোষণাকারী আহ্বান করতে থাকে যে, হে কল্যাণের অনুসন্ধানকারী তুমি আরও অগ্রসর হও! হে অসৎ কাজের পথিক, তোমরা অন্যায় পথে চলা বন্ধ করো। তুমি কি জান? এ মাসের প্রতি রাতে আল্লাহ তাআলা কত লোককে জাহান্নাম থেকে মুক্তি দিয়ে থাকেন।’ (সুনান তিরমিজি, হাদিস : ৬৮৪)।

১০.**নিয়মিত তাহাজ্জুদ নামাজ আদায় করা:** তাহাজ্জুদ নামাজের রয়েছে বিশেষ ফজিলত। এ নামাজ রাতের শেষ তৃতীয়াংশে নির্জনে একাকী মহান প্রতিপালকের সামনে সিজদায় অবনত হয়ে তার নৈকট্যলাভের অন্যতম মাধ্যম। রমজানের বিশেষ ফজিলতের কারণে এ মাসে এই নামাজের জন্য রয়েছে আরও বেশি সাওয়াব ও ফায়দা।

আবু হুরায়রা রাদিয়াল্লাহু তাআলা আনহু থেকে বর্ণিত হাদীসে নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন: 'ফরজ সালাতের পর সর্বোত্তম সালাত হলো রাতের সালাত অর্থাৎ তাহাজ্জুদের সালাত। ' [সহিহ মুসলিম : ২৮১২]।

১১.**অধিক পরিমানে দান-সদাকাহ করা:** পবিত্র মাহে রমজানে রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম অন্যান্য মাসের থেকে দান সদকা বাড়িয়ে দিতেন। আমাদেরও উচিত পবিত্র এই মাসে বেশি বেশি সদকা করা। যাকাত যাদের ফরজ তারা অবশ্যই জাকাত আদায় করে থাকেন।

আবদুল্লাহ ইবনে আববাস রাদিয়াল্লাহু আনহু থেকে বর্ণিত : 'রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ছিলেন মানুষের মধ্যে সবচেয়ে বেশি দানশীল আর রমজানে তাঁর এ দানশীলতা আরও বেড়ে যেত। ' [সহিহ আল-বুখারী : ১৯০২]।

১২.**উত্তম চরিত্র গঠনের অনুশীলন করা:** রমজান মাস চরিত্র গঠনের মাস। আত্মশুদ্ধি, আত্মোপলব্ধি এবং আত্মোন্নয়নের মাস। এ মাসে চারিত্রিক উন্নয়নে সচেষ্ট হতে হবে। এমনভাবে প্রশিক্ষণ নিতে হবে, যার মাধ্যমে বাকি মাসগুলো পরিচালিত হয় সুন্দরভাবে।

রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন : 'তোমাদের মধ্যে কেউ যদি রোজা রাখে, সে যেন তখন অশ্লীল কাজ ও শোরগোল থেকে বিরত থাকে। রোযা রাখা অবস্থায়

কেউ যদি তার সঙ্গে গালাগালি ও মারামারি করতে আসে, সে যেন বলে, আমি রোযাদার।' [সহিহ মুসলিম : **১১৫১**]।

১৩.ইতিকাফ: মাহে রমজানের অন্যতম আমল ইতিকাফ। ইতিকাফ অর্থ অবস্থান করা। অর্থাৎ মানুষজনের কোলাহল থেকে পৃথক হয়ে সালাত, সিয়াম, কোরআন তিলাওয়াত, দুয়া, ইসতিগফার ও অন্যান্য ইবাদাতের মাধ্যমে আল্লাহ তাআলার সান্নিধ্যে একাকী কিছু সময় যাপন করা।

আবু হুরাইরা রাদিয়াল্লাহু আনহু থেকে বর্ণিত : 'প্রত্যেক রমজানেই রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম শেষ দশ দিন ইতিকাফ করতেন। কিন্তু জীবনের শেষ রমজানে তিনি ইতিকাফ করেছিলেন বিশ দিন। দশ দিন ইতিকাফ করা সুন্নাত।' [সহিহ আল-বুখারী : ২০৪৪]

১৪.**দাওয়াতে দ্বীনের কাজে অংশ গ্রহণ করা:** মাহে রমজান উত্তম আমলের মাস। আর দ্বীনের দাওয়াত এমনিতেই উত্তম একটি আমল। দ্বীনের দাওয়াতের মাধ্যমে মানুষকে আল্লাহ তাআলার দিকে ডাকা হয়। বিপথগামী বান্দাহকে মহান স্রষ্টার দিকে ডেকে আনা।

আল কোরআনের ঘোষণা : 'ওই ব্যক্তির চাইতে উত্তম কথা আর কার হতে পারে যে আল্লাহ তাআলার দিকে ডাকল, নেক আমল করল এবং ঘোষণা করল, আমি একজন মুসলিম।' [সুরা হা-মীম সাজদাহ : ৩৩]।

১৫.ওমরাহ পালন করা: মাহে রমজানে একটি ওমরাহ করলে একটি হজ আদায়ের সমান সাওয়াব হয়। আবদুল্লাহ ইবনে আববাস রাদিয়াল্লাহু আনহু থেকে বর্ণিত হাদিসে

এসেছে, রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন : 'রমজান মাসে ওমরাহ করা আমার সঙ্গে হজ আদায় করার সমতুল্য। ' [সহিহ আল-বুখারী : **১৮৬৩**]।

১৬.**শেষ দশকের বেজোড় রাতে লাইলাতুল কদরের সন্ধান করা:** পবিত্র মাহে রমজানে এমন বরকতময় একটি রাত রয়েছে যা হাজার মাসের চেয়ে উত্তম। আল কোরআনে আছে- 'কদরের রাত হাজার মাসের চেয়েও উত্তম।' [সুরা কদর : ৪]।

মহিমান্বিত এ রজনী পাওয়া বিরাট সৌভাগ্যের বিষয়। এক হাদিসে আয়েশা রাদিয়াল্লাহু তাআ'লা আনহা বলেন : 'রাসূলে আরাবি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম অন্য সময়ের তুলনায় রমজানের শেষ দশ দিনে অধিক হারে পরিশ্রম করতেন।' [সহিহ মুসলিম : **১১৭৫**]।

১৭.**বেশি বেশি দুআ করা এবং আল্লাহর রহমত প্রার্থনা করা**: হাদিসে বলা হয়েছে- 'আদ্দুআউ মুখখুল ইবাদাহ', অর্থাত, দুআ ইবাদাতের মগজ। দুআ একটি গুরুত্বপূর্ণ ইবাদাত। এজন্য এ মাসে বেশি বেশি দুআ করা ও আল্লাহ সুবহানাহু ওয়াতাআ'লার নিকট বেশি বেশি কান্নাকাটি করে প্রার্থনা করা।

হাদিসে এসেছে: 'ইফতারের মুহূর্তে আল্লাহ রাব্বুল আলামীন বহু লোককে জাহান্নাম থেকে মুক্তি দিয়ে থাকেন। মুক্তির এ প্রক্রিয়া রমজানের প্রতি রাতেই চলতে থাকে।' [আল জামিউস সাগীর : ৩৯৩৩]।

১৮.**ইফতার করা:** মাহে রমজানে ইফতারির সময় হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে ইফতার করা বিরাট ফজিলতপূর্ণ আমল। এক্ষেত্রে কোনো সময়ক্ষেপণ না করেই ইফতার করতে হবে।

হাদিসে এসেছে : ‘যে ব্যক্তি সিয়াম পালন করবে, সে যেন খেজুর দিয়ে ইফতার করে, খেজুর না পেলে পানি দিয়ে ইফতার করবে। কেননা পানি হলো অধিক পবিত্র। ’ [সুনান আবু দাউদ : ২৩৫৭, সহিহ]।

১৯.**রোজাদারদের ইফতার করানো:** রোজাদারদের ইফতার করানো অনেক সাওয়াবের কাজ। প্রতিদিন কমপক্ষে একজন রোজাদারকে ইফতার করানোর চেষ্টা করতে হবে।

হাদিসে এসেছে : ‘যে ব্যক্তি কোনো রোযাদারকে ইফতার করাবে, সে তার সমপরিমাণ সাওয়াব লাভ করবে, তাদের উভয়ের সাওয়াব হতে বিন্দুমাত্র কমানো হবে না।’ [সুনান ইবন মাজাহ : ১৭৪৬, সহিহ]।

২০.**তওবা ও ইস্তেগফার করা:** 'তওবা' শব্দের আভিধানিক অর্থ- 'ফিরে আসা', পারিভাষিক অর্থে- 'আল্লাহ তাআ’লার কাছে গুনাহের জন্য লজ্জিত হয়ে বিনীতভাবে ক্ষমা চেয়ে পুনরায় উক্ত গুনাহের কাজ আর কখনো না করার সিদ্ধান্ত নেওয়া'। পবিত্র রমজান মাস তওবা করার উত্তম সময়। তওবাকারীকে আল্লাহ পাক ভালোবাসেন।

আল কোরআনে আছে- ‘হে ইমানদারগণ, তোমরা আল্লাহর কাছে তওবা কর, খাঁটি তওবা; আশা করা যায়, তোমাদের রব তোমাদের পাপসমূহ মোচন করবেন এবং তোমাদেরকে এমন জান্নাতসমূহে প্রবেশ করাবেন যার পাদদেশে নহরসমূহ প্রবাহিত। সেদিন আল্লাহ নবী এবং তার বিশ্বাসী সহচরদেরকে অপদস্থ করবেন না। তাদের নূর তাদের সামনে ও ডানদিকে ছুটোছুটি করবে। তারা বলবে- হে আমাদের পালনকর্তা, আমাদের নূরকে পূর্ণ করে দিন এবং আমাদেরকে ক্ষমা করুন। নিশ্চয় আপনি সবকিছুর ওপর সর্ব শক্তিমান। ’ [সুরা আত-তাহরীম : ৮]।

২১. **তাকওয়া অর্জন করা**: তাকওয়া এমন একটি গুণ, যা বান্দাকে আল্লাহর ভয়ে যাবতীয় পাপকাজ থেকে বিরত রাখে এবং তাঁর আদেশ মানতে বাধ্য করে। আর রমজান মাস তাকওয়া নামক গুণটি অর্জন করার এক বিশেষ মৌসুম।

কোরআনে এসেছে: 'হে ঈমানদারগণ! তোমাদের ওপর রোজা ফরজ করা হয়েছে, যেমন ফরজ করা হয়েছিল তোমাদের পূর্ববর্তীদের ওপর। যাতে করে তোমরা এর মাধ্যমে তাকওয়া অবলম্বন করতে পার।' [সুরা আলবাকারাহ : ১৮৩]।

২২.**ফজরের পর সূর্যোদয় পর্যন্ত মাসজিদে অবস্থান করা**: ফজরের পর সূর্যোদয় পর্যন্ত মাসজিদে অবস্থান করা। এটি একটি বিরাট সাওয়াবের কাজ। এ বিষয়ে রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহ আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন : 'যে ব্যক্তি ফজরের নামাজ জামাতে আদায় করার পর সূর্যোদয় পর্যন্ত মাসজিদে অবস্থান করবে, অতঃপর দুই রাকাআত সালাত আদায় করবে, সে পরিপূর্ণ হজ ও ওমরাহ করার প্রতিদান পাবে। [সুনান আত-তিরমিযী : ৫৮৬]।

২৩.**ফিতরাহ দেওয়া:** এ মাসে সিয়ামের ত্রুটি-বিচ্যুতি পূরণার্থে ফিতরাহ দেওয়া আবশ্যক। ইবনে উমর রাদিয়াল্লাহু আনহু বলেন : রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ঈদের নামাজ আদায়ের পুর্বে ফিতরাহ আদায় করার আদেশ দিলেন। [সহিহ আল-বুখারী :১৫০৩]।

২৪. **অপরকে খাদ্য খাওয়ানো:** রমজান মাসে লোকদের খাওয়ানো, বিশেষ করে সিয়াম পালনকারী গরীব, অসহায়কে খাদ্য খাওয়ানো বিরাট সাওয়াবের কাজ ।

কোরআনে এসেছে: 'তারা খাদ্যের প্রতি আসক্তি থাকা সত্ত্বেও মিসকীন, ইয়াতীম ও বন্দিকে খাদ্য দান করে।' [সুরা আদ-দাহর: ৮]।

২৫.**আত্মীয়তার সম্পর্ক উন্নীত করা**: আত্মীয়তার সম্পর্ক একটি গুরুত্বপূর্ণ বিষয়। আর তা রক্ষা করাও একটি ইবাদাত। এ বিষয়ে আল্লাহ তাআলা বলেন : 'হে মানব সমাজ! তোমরা তোমাদের পালনকর্তাকে ভয় কর, যিনি তোমাদেরকে এক ব্যক্তি থেকে সৃষ্টি করেছেন এবং যিনি তার থেকে তার সঙ্গিনীকে সৃষ্টি করেছেন; আর বিস্তার করেছেন তাদের দু'জন থেকে অগণিত পুরুষ ও নারী। আর আল্লাহকে ভয় কর, যাঁর নামে তোমরা একে অপরের নিকট যাচঞা করে থাক এবং আত্মীয় জ্ঞাতিদের ব্যাপারে সতর্কতা অবলম্বন কর। নিশ্চয় আল্লাহ তোমাদের ব্যাপারে সচেতন রয়েছেন।' [সুরা আন-নিসা: ১]।

২৬.**কোরআন মুখস্থ বা হিফজ করা:** কোরআন হিফজ করা একটি গুরুত্বপূর্ণ বিষয়। কেননা আল্লাহ তাআলা নিজেই কোরআন হিফজের দায়িত্ব নিয়েছেন। তিনি এ দায়িত্ব মূলত বান্দাদেরকে কোরআন হিফজ করানোর মাধ্যমেই সম্পাদন করেন।

কোরআনে এসেছে : 'নিশ্চয় আমি কোরআন নাজিল করেছি, আর আমিই তার হিফাযতকারী।' [সুরা আল-হিজর: ৯]।

২৭.**আল্লাহর যিকর করা:** এ বিষয়ে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন: ''আল্লাহ তা'আলা চারটি বাক্যকে বিশেষভাবে নির্বাচিত করেছেন, তাহলো যে ব্যক্তি পড়বে, তার জন্য দশটি সাওয়াব লেখা হয়, আর বিশটি গুনাহ মিটিয়ে দেয়া হয়। যে ব্যক্তি পড়বে, তার জন্য বিশটি সাওয়াব লেখা হয়, আর বিশটি গুনাহ মিটিয়ে দেয়া হয়। যে ব্যক্তি পড়বে, তার জন্য বিশটি সাওয়াব লেখা হয়, আর বিশটি গুনাহ মিটিয়ে দেয়া হয়। আর যে ব্যক্তি আন্তরিকভাবে পড়বে, তার জন্য ত্রিশটি সাওয়াব লেখা হয়, আর ত্রিশটি গুনাহ মিটিয়ে দেয়া হয়''। [মুসনাদ আহমাদ : ১১৩৪৫]।

২৮. **মিসওয়াক করা:** মেসওয়াকের প্রতি রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম অশেষ গুরুত্বারোপ করেছেন। হাদীসে এসেছে: অর্থাৎ মেসওয়াক মুখের জন্য পবিত্রকারী, এবং রবের সন্তুষ্টি আনয়নকারী। রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম রোযা রেখেও মেসওয়াক করতেন বলে বিভিন্ন বর্ণনায় পাওয়া যায়। [সহীহ ইবন খুযাইমাহ : **১৩৫**]।

২৯.**একজন অপরজনকে কুরআন শুনানো**: রমাদান মাসে একজন অপরজনকে কুরআন শুনানো একটি উত্তম আমল। এটিকে দাওর বলা হয়। ইবনে আববাস রাদিয়াল্লাহু আনহু থেকে বর্ণিত হাদীসে এসেছে: জিবরাইল আলাইহিস সালাম রমাদানের প্রতি রাতে রমাদানের শেষ পর্যন্ত রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর সাথে সাক্ষাৎ করতেন এবং রাসূল তাকে কুরআন শোনাতেন। [সহীহ আল-বুখারী : ১৯০২]।

ইবনে হাজার রাহেমাহুল্লাহ্ বলেন : জিবরাইল প্রতি বছর রাসূলের সাথে সাক্ষাৎ করে এক রমযান হতে অন্য রমযান অবধি যা নাযিল হয়েছে, তা শোনাতেন এবং শুনতেন। যে বছর রাসূলের অন্তর্ধান হয়, সে বছর তিনি দু বার শোনান ও শোনেন ।

৩০. **কুরআন বুঝা ও আমল করা:** কুরআনের এ মাসে কুরআন বুঝা ও আমল করা গুরুত্বপূর্ণ ইবাদাত। কুরআন অনুযায়ী নিজের জীবনকে গড়ে তোলা। এ বিষয়ে কুরআনে নির্দেশ দেয়া হয়েছে: ‘তোমাদের প্রতি তোমাদের রবের পক্ষ থেকে যা নাযিল করা হয়েছে, তা অনুসরণ কর এবং তাকে ছাড়া অন্য অভিভাবকের অনুসরণ করো না। তোমরা সামান্যই উপদেশ গ্রহণ কর’। [সূরা আল-আ‘রাফ : ৩]।

কুরআনের জ্ঞানে পারদর্শী আবদুল্লাহ ইবন মাসউদ রাদিয়াল্লাহু আনহু বলেন: ‘আমরা যখন নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম হতে কুরআনের দশটি আয়াত শিক্ষা গ্রহণ করতাম, এরপর ততক্ষণ পর্যন্ত আমরা পরবর্তী দশটি আয়াত শিক্ষা করতাম না,

যতক্ষণ পর্যন্ত না আমরা এই দশ আয়াতের ইলম ও আমল শিখতাম’ [শরহে মুশকিলুল আছার : ১৪৫০]।

যা করণীয় নয়:

রমাদান মাসের ফজিলত হাসিল করার জন্য এমন কিছু কাজ রয়েছে যা থেকে বিরত থাকা দরকার, সেগুলো নিম্নে উপস্থাপন করা হলো :

1. বিলম্বে ইফতার করা
2. সাহরী না খাওয়া
3. শেষের দশ দিন কেনা কাটায় ব্যস্ত থাকা
4. মিথ্যা বলা ও অন্যান্য পাপ কাজ করা
5. অপচয় ও অপব্যয় করা
6. তিলাওয়াতের হক আদায় না করে কুরআন খতম করা
7. জামা‘আতের সাথে ফরয সালাত আদায়ে অলসতা করা
8. বেশি বেশি খাওয়া
9. রিয়া বা লোক দেখানো ইবাদাত করা
10. বেশি বেশি ঘুমানো
11. সংকট তৈরি করা জিনিস পত্রের দাম বৃদ্ধির জন্য
12. অশ্লীল ছবি, নাটক দেখা
13. বেহুদা কাজে রাত জাগরণ করা
14. বিদ‘আত করা
15. দুনিয়াবী ব্যস্ততায় মগ্ন থাকা

রমাদান মাস পাওয়ার মত সৌভাগ্যের বিষয় আর কী হতে পারে! আমরা যদি এ মাসের প্রতিটি আমল সুন্নাহ পদ্ধতিতে করতে পারি তবেই আমাদের রমাদান পাওয়া সার্থক হবে।কেননা হাদীসে এসেছে: ‘‘যে ব্যক্তি রমাদান মাস পেলো অথচ তার গুনাহ মাফ করাতে পারল না সে ধ্বংস হোক।’’ [শারহুস সুন্নাহ : ৬৮৯] আল্লাহ তা‘আলা আমাদেরকে রমাদান মাসের ফজিলত হাসিল করার তাওফীক দিন। আমীন।

রমজানের প্রথম রাতে আসমানে যে ঘোষণা দেওয়া হয়ঃ

রমজানের প্রথম রাতে আসমানে যে ঘোষণা দেওয়া হয়ঃ

বরকত ও কল্যাণের মাস রমজান মাস। আল্লাহর দয়া এবং অনুগ্রহ লাভের মাস। এ মাসে আল কোরআন নাজিল হয়েছে। এই মাসে মানুষের মাঝে সংযম, সুশৃঙ্খলতা ও নিয়মানুবর্তিতা তৈরি হয়। এ মাসে মানুষ আল্লাহর আরও বেশি ঘনিষ্ঠ ও কাছের হয়।

আবু হুরায়রা (রা.) থেকে বর্ণিত, রাসুল (সা.) বলেছেন,

যখন রমজান মাসের প্রথম রাতের আগমন ঘটে তখন দুষ্ট জিন ও শয়তানদের বন্দি করা হয়। জাহান্নামের দরজাগুলো বন্ধ করে দেওয়া হয়, তার একটি দরজাও খোলা হয় না এবং জান্নাতের দরজাগুলো খুলে দেওয়া হয়, তার একটি দরজাও বন্ধ করা হয় না।

আর একজন ঘোষক ঘোষণা করতে থাকে— হে কল্যাণের প্রত্যাশী! অগ্রসর হও, হে অকল্যাণের প্রার্থী! থেমে যাও। আর আল্লাহ তাআলা এ মাসের প্রতি রাতে অসংখ্য জাহান্নামিকে মুক্তি দান করেন। (সুনানে তিরমিজি, হাদিস : ৬৮২)।

এই হাদিস থেকে বোঝা যায়, রমজান মাস উপলক্ষে আল্লাহ তাআলার পক্ষ থেকে বান্দার জন্য ৪টি উপহারের কথা বর্ণিত হয়েছে।

১. **প্রথম ঘোষণা**: দুষ্ট জিন ও শয়তানদের বন্দি করা হয়, যাতে তারা মুমিন বান্দার অন্তরে ওয়াসওয়াসা সৃষ্টি করতে না পারে। মুমিন বান্দা যেন নির্বিঘ্নে ইবাদত-বন্দেগি করতে পারে।

২.**দ্বিতীয় ঘোষণা**: এ মাসে জাহান্নামের দরজাগুলো বন্ধ করে দেওয়া হয়, তার একটি দরজাও খোলা হয় না এবং জান্নাতের দরজাগুলো খুলে দেওয়া হয়, তার একটি দরজাও বন্ধ করা হয় না। জাহান্নামের দরজা বন্ধ করে দেওয়া মানে পাপ এবং অকল্যাণের দরজা বন্ধ করে দেওয়া। আর জান্নাতের দরজা খুলে দেওয়া মানে ভালো ও কল্যাণের দরজা খুলে দেওয়া।

৩.**তৃতীয় ঘোষণা**: এ মাসে আল্লাহর পক্ষ থেকে একজন ঘোষক ঘোষণা করতে থাকেন—হে কল্যাণের প্রত্যাশী! অগ্রসর হও, হে অকল্যাণের প্রার্থী! থেমে যাও। এ মাস কল্যাণের মাস, বরকত ও পুণ্যের মাস। তাই কল্যাণপ্রত্যাশীরা যেন আরও আগ্রহী ও উদ্যমী হয়। তারা যেন ইবাদতের মাত্রা বাড়িয়ে দেয় এবং অকল্যাণের প্রার্থীরা যেন সংযমী হয়। তারা যেন পাপের মাত্রা কমিয়ে ফেলে।

৪. **চতুর্থ ঘোষণা**: এ মাসের প্রতি রাতে অসংখ্য জাহান্নামিকে মুক্তিদান করেন আল্লাহ তাআলা। বান্দার প্রতি আল্লাহ তাআলার দয়ার আরেকটি নিদর্শন হলো, তিনি রমজান মাসের প্রতি রাতে অসংখ্য বান্দাকে জাহান্নাম থেকে মুক্তি দান করেন।

রমজান মাস ধৈর্যের মাসঃ

আমাদের প্রিয়নবী রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন, 'আদম সন্তানের প্রতিটি কাজই ১০ গুণ থেকে ৭০০ গুণ বৃদ্ধি করা হয়। মহান আল্লাহ তাআলা বলেন, কিন্তু রোজা ছাড়া। কেননা তা আমার জন্য, তাই আমি এর প্রতিদান দেব। সে আমার সন্তুষ্টির জন্য কামাচার ও পানাহার পরিত্যাগ করে। রোজা পালনকারীর জন্য রয়েছে দুটি খুশি যা তাকে খুশী করে। যখন সে ইফতার করে, সে খুশি হয় এবং যখন সে তার রবের সাথে সাক্ষাৎ করবে, তখন রোজার বিনিময়ে আনন্দিত হবে। রোজা পালনকারীর মুখের (না খাওয়াজনিত) ঘ্রাণ আল্লাহর কাছে মিসকের ঘ্রাণের চেয়েও উত্তম।' (বুখারি ১৯০৪, মুসলিম ১১৫১)

অন্য এক বর্ণনায় এসেছে,

لِكُلِّ عَمَلٍ كَفَّارَةٌ، وَالصَّوْمُ لِي وَأَنَا أَجْزِي بِهِ

'প্রত্যেক আমলেরই কাফফারা আছে। রোজা আমার জন্য, তাই আমি এর প্রতিদান দেব।' (বুখারি ৭৫৩৮, মুসনাদে আহমাদ ১০৫৫৪)।

রোজাকে অন্য আমলের বর্ধিত সওয়াব থেকে আলাদা করা হয়েছে। অন্যান্য আমলের সওয়াব ১০ গুণ থেকে ৭০০ গুণ করার কথা বলা হলেও রোজার ব্যাপারটি আলাদা। কেননা এর সওয়াব সীমাবদ্ধ নয়; বরং আল্লাহ তাআলা রোজার সওয়াব বহু গুণে দান করবেন। কেননা রোজা সবর তথা ধৈর্য থেকে এসেছে। আল্লাহ তাআলা বলেছেন-

إِنَّمَا يُوَفَّى ٱلصَّٰبِرُونَ أَجْرَهُم بِغَيْرِ حِسَابٍ

'কেবল ধৈর্যশীলদেরকেই তাদের প্রতিদান পূর্ণরূপে দেওয়া হবে, কোনো হিসাব ছাড়াই।' (সুরা যুমার: আয়াত ১০)।

ধৈর্য ৩ ধরনের। এ ৩ ধরণের ধৈর্য রোজার মধ্যে একত্রিত হয়।

১. আল্লাহর আনুগত্যের ওপর ধৈর্যধারণ করা

২. আল্লাহর হারাম জিনিস থেকে বিরত থাকতে ধৈর্যধারণ করা এবং

৩. আল্লাহর ফয়সালাকৃত কষ্টের উপর ধৈর্যধারণ করা।

এ কারণেই রাসুলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন:

وَهُوَ شَهْرُ الصَّبْرِ، وَالصَّبْرُ ثَوَابُهُ الْجَنَّةُ

‘রমজান মাস ধৈর্যের মাস। আর ধৈর্যের প্রতিদান জান্নাত।’ (ইবন খুযাইমা ১৮৮৭)। আল্লাহ তাআলা আমাদের সবাইকে আমল করার তাওফিক দান করুন। আমিন।

রোজার প্রতিদানঃ

রোযার প্রতিদানসমূহ-

রোযার সবচেয়ে বড় প্রতিদান হলো আল্লাহ তা'আলার সন্তুষ্টি ও নৈকট্য অর্জন করতে পারা এবং আপন প্রতিপালকের জন্য নিজের মানবিক চাহিদা বিসর্জন দিয়ে গুনাহ থেকে বেঁচে থাকা ও তাকওয়ার অনুশীলন করতে পারা।

বান্দার এই অনুশীলনকে যথার্থ ও তার সংযমকে সার্থক করার জন্য প্রয়োজন গুনাহ থেকে মুক্ত হয়ে আগ্রহের সঙ্গে হক আদায় করে রোযা রাখা। এভাবেই রোযার ফজিলত ও উপকরণসমূহ পাওয়ার আশা করা যায়।নিম্নে রোযার কয়েকটি প্রতিদান উল্লেখ হলো-

রোযার প্রতিদান আল্লাহ নিজেই দেবেন -

প্রত্যেক নেক আমলের নির্ধারিত সওয়াব ও প্রতিদান রয়েছে, যার মাধ্যমে আল্লাহ তা'য়ালা আমলকারীকে পুরষ্কৃত করবেন। কিন্তু রোযার বিষয়টি সম্পূর্ণ আলাদা।কারন রোযার বিষয়ে আছে, আল্লাহ তা'য়ালার পক্ষ হতে এক অনন্য ঘোষণা।

হযরত আবু হুরায়রা রা. হতে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেছেন,

মানুষের প্রত্যেক আমলের প্রতিদান বৃদ্ধি করা হয়। একটি নেকীর সওয়াব দশ গুন থেকে সাতশ গুন পর্যন্ত বৃদ্ধি পায়। আল্লাহ তা'য়ালা বলেন, কিন্তু রোযার বিষয়টি আলাদা।কেননা তা একমাত্র আমার জন্য এবং আমি নিজেই এর প্রতিদান দিব। বান্দা

তো আমার জন্য নিজের প্রবৃত্তিকে নিয়ন্ত্রণ করে এবং পানাহার পরিত্যাগ করে। [সহীহ মুসলিম, হাদীস: ১১৫১ (১৬৪)]।

অন্য বর্ণনায় আছে, আল্লাহ তায়ালা বলেন,' প্রত্যেক ইবাদতই ইবাদতকারীর জন্য, আর রোযা আমার জন্য। আমি নিজেই এর প্রতিদান দিব। [সহীহ বুখারী,হাদিস: ১০৯৪]।

সমস্ত সৃষ্টির স্রষ্টা, বিশ্বজাহানের প্রতিপালক, মহান আল্লাহ তায়ালা নিজেই যখন এর পুরষ্কার দেবেন, তখন কি পরিমান দেবেন?? ইমাম আওযায়ী রাহ, এ হাদীসের ব্যাখ্যায় বলেছেন, আল্লাহ রোযাদারকে যে প্রতিদান দেবেন, তা মাপা হবে না, ওজন করা হবে না অর্থাৎ বিনা হিসাবেই দেবেন।

<u>রোযাদারকে আল্লাহ তায়ালা পানি পান করাবেন</u> -

হযরত আবু মুসা আশআরী রা. হতে বর্ণিত,
" নিশ্চয় আল্লাহ রাব্বুল আলামীন নিজের ওপর অবধারিত করে নিয়েছেন যে, যে ব্যক্তি তার সন্তষ্টির জন্য গরমের দিনে (রোযার কারনে) পিপাসার্ত থেকেছে, তিনি তাকে তৃষ্ণার দিবসে (কিয়ামতের দিন) পানি পান করাবেন। [মুসনাদে বাযযার,হাদিস: ১০৩৯; মাযমাউয যাওয়ায়েদ, হাদীস: ৫০৯৫]।
হযরত আবু হুরায়রা রা. হতে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামযাসাল্লাম ইরশাদ করেছেন-

আল্লাহ তায়ালা বলেন, রোযা আমার জন্য।আমি নিজেই এর প্রতিদান দিব।কিয়ামতের দিন রোযাদারদের জন্য এক বিশেষ পানির হাউজ থাকবে, যেখানে রোযাদারগন ব্যতীত

অন্য কারো আগমন ঘটবে না।[মুসনাদে বাযযার,,হাদীস:৮১১৫ মাযমাউয যাওয়ায়েদ. হাদীস: ৫০৯৩]।

রোযা হল জান্নাত লাভের পথ -

হযরত আবুবু উমামা রা. বলেছেন,

আমি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের দরবারে এসে বললাম, " ইয়া রাসূলুল্লাহ! আমাকে এমন একটি আমল বলে দিন, যার মাধ্যমে আমি জান্নাতে প্রবেশ করতে পারবো। " উত্তরে তিনি বললেন, তুমি রোযা রাখো,কেননা এর সমতুল্য কিছু নেই। অত:পর আমি পুনরায় তার কাছে এসে একই কথা বললাম।এবারও তিনি বললেন, রোযা রাখো।[মুসনাদে আহমদ, হাদীস: ২২১৪৯ সহীহ ইবনে খুযাইমা, হাদীস: ১৮৯৩; সহীহ ইবনে হিব্বান, হাদীস:৩৫২৬]।

রোযাদার 'রাইয়ান' গেট দিয়ে জান্নাতে প্রবেশ করবে-

হযরত সাহল ইবনে সাদ রা. হতে বর্ণিত, নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসল্লাম ইরশাদ করেছেন,

"জান্নাতে একটি দরজা আছে, যার নাম রাইয়ান।কিয়ামতের দিন এ দরজা দিয়ে শুধু রোযাদারই প্রবেশ করবে। অন্য কেউ প্রবেশ করতে পারবে না। ঘোষনা করা হবে- কোথায় রোযাদারগন? তখন তারা উঠে দাঁড়াবে। তারা ব্যতীত কেউ এ দরজা দিয়ে প্রবেশ করতে পারবে না। অত:পর রোযাদারগন যখন প্রবেশ করবে, তখন তা বন্ধ করে দেওয়া হবে। [সহীহ বুখারী, হাদীস: ১৮৯৬;সহীহ মুসলিম, হাদীস:১১৫২]।

রোযা জাহান্নাম থেকে রক্ষাকারী ঢাল ও দূর্গ -

হযরত জাবিরা রা. হতে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, "আমাদের মহান রব ইরশাদ করেছেন- রোযা হল ঢাল। বান্দা এর দ্বারা নিজেকে জাহান্নামের আগুন থেকে রক্ষা করবে।রোযা আমার জন্য আর আমিই এর প্রতিদান দিব।[মুসনাদে আহমদ,হাদীস: ১৪৬৬৮: সহীহ ইবনে খুযাইমা,হাদীস: ২১২৫; সহীহ ইবনে হিব্বান,হাদীস:৩৬৪৯, সুনানে ইবনে মাজাহ,হাদীস: ১৬৩৯]।

হযরত আবু হুরায়রা রা. হতে বর্ণিত, নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেছেন,

রোযা হল ঢাল এবং (জাহান্নাম থেকে পরিত্রান লাভের) সুরক্ষিত দুর্গ। [মুসনাদে আহমদ, হাদীস: ৯২২৫; শুয়াবুল ঈমান, বাইহাকী, হাদীস: ৩৫৭১]।

রোযা কিয়ামতের দিন সুপারিশ করবে -

হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে আমর রা. হতে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেছেন, " অর্থাৎ রোযা ও কুরআন কিয়ামতের দিন বান্দার জন্য সুপারিশ করবে। রোযা বলবে, হে রব! আমি তাকে খাদ্য ও যৌন সম্ভোগ থেকে বিরত রেখেছি। কুরআন বলবে, আমি তাকে রাতের ঘুম থেকে বিরত রেখেছি (অর্থাৎ না ঘুমিয়ে সে তেলাওয়াত করেছে) অতএব, তার ব্যাপারে আমার সুপারিশ কবুল করুন। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন, অত:পর তাদের উভয়ের সুপারিশ গ্রহণ করা হবে।[মুসনাদে আহমদ, হাদীস: ৬৬২৬, মুসতাদরাকে হাকীম,হাদীস: ২০৮০]।

রোযাদারের গুনাহ মাফ হয়ে যায়-

হযরত আবু হুরায়রা রা. হতে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসল্লাম ইরশাদ করেছেন,

"যে ব্যক্তি ঈমানের সঙ্গে সওয়াবের আশায় রমযান মাসে রোযা রাখবে, তার পূর্ববর্তী গুনাহ সমূহ ক্ষমা করে দেওয়া হবে।[সহীহ বুখারী, হাদীস: ৩৮, সহীহ মুসলিম ৭৬০]।

হযরত আব্দুর রহমান ইবনে আওফ রা. বর্ণিত করেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেন, "আল্লাহ তায়ালা তোমাদের ওপর রমযানের রোযা ফরয করেছেন। আর আমি কিয়ামে রমাযান (অর্থাৎ তারাবী'র নামাজকে) সুন্নৎ করেছি। সুতরাং, যে ঈমানের সঙ্গে সওয়াবের আশায় রমযানের সিয়াম ও কিয়াম আদায় করবে, সে ঐ দিনের মত নিষ্পাপ হয়ে যাবে যেদিন সে মায়ের গর্ভ থেকে ভূমিষ্ঠ হয়েছিলো। [মুসনাদে আহমদ, হাদীস: ১৬৬০, মুসান্নাফ ইবনে আবি শায়বা, হাদীস: ৭৭৮৭, সহীহ ইবনে খুযাইমা, হাদীস: ২২০১]

রোযাদারের মুখের গন্ধ মিশকের চেয়েও সুগন্ধিযুক্ত-

হযরত আবু হুরায়রা রা. বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেছেন, " সেই সত্তার শপথ, যার হাতে মুহাম্মাদের জীবন, রোযাদারদের মুখের দুর্গন্ধ আল্লাহর নিকট মিশকের সুরভির চেয়েও অধিক সুগন্ধিময়।[সহীহ বুখারী,হাদীস;১৯০৪ ; সহীহ মুসলিম, হাদীস: ১১৫১]।

উল্লেখ্য, এই হাদীসে দুর্গন্ধ দ্বারা পানাহার বর্জনের কারনে স্বাভাবিকভাবে যে গন্ধ হয় তা বোঝানো হয়েছে। দাঁত ও মুখের অপরিচ্ছন্নতাজনিত দুর্গন্ধ উদ্দেশ্য নয়। তাই

রোযাদার অবশ্যই মিসওয়াক করবে এবং দাঁত ও মুখ পরিষ্কার রাখার বিষয়ে সচেতন থাকবে। এটি সব সময়ের কর্তব্য।

রোযাদারের জন্য দুনিয়াতে আনন্দ, পরকালেও আনন্দ-

হযরত আবু হুরায়রা রা. হতে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেছেন,

রোযাদারের জন্য দুটি আনন্দের মূহুর্ত রয়েছে, এক. যখন সে তার রবের সঙ্গে মিলিত হবে, তখন রোযার কারনে আনন্দিত হবে।

অন্য বর্ণনায় আছে, যখন সে আল্লাহর সঙ্গেমিলিত হবে, আর তিনি তাকে রোযার পুরষ্কার দিবেন। তখন সে আনন্দিত হবে।[সহীহ বুখারী, হাদীস: ১৯০৪, সহীহ মুসল্য,হাদীস; ১১৫১]।

রোযাদারের দুআ নিশ্চিত কবুল হয় -

হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে আমর রা. হতে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেছেন,

ইফতারের সময় রোযাদারের একটি দুআ ফিরিয়ে দেওয়া হয় না।(অর্থাৎ তা কবুল করা হয়)। [সুনানে ইবনে মাজাহ,হাদীস:১৭৫৩]।

হযরত আবু হুরায়রা রা. হতে বর্ণিত করেন, নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেছেন, " " "রোযাদারের দু'আ ফিরিয়ে দেওয়া হয় না।"

রোযা হিংসা- বিদ্বেষ দূর করে-

হযরত আব্দুল্লকহ ইবনে আব্বাস রা. হতে বর্নিত, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেছেন,

সবরের মাস (রমযান) এর রোযা এবং প্রতি মাসের তিন দিন (আইয়্যামে বীয :১৩, ১৪, ১৫) -এর রোযা অন্তরের হিংসা - বিদ্বেষ দূর করে দেয়।

[মুসনাদে বাযযার, হাদীস:১০৫৭; ওয়াত তারহীব, হাদীস: ১৫৬৩]।

প্রতিদান পাওয়ার শর্ত-

প্রকাশ থাকে যে, রোযার প্রতিদানসমূহ লাভ করতে হলে এবং এর বরকত ও পুরষ্কারসমূহ পেতে হলে এবং কাঙ্ক্ষিত লক্ষ্য অথা অত্নশুদ্ধি, ধৈর্য, তাকওয়া ও খোদাভীতি অর্জন করতে হলে শুধু পানাহার ও স্ত্রী সম্ভোগ ত্যাগ করাই যথেষ্ট নয়। কারন এগুলো ত্যাগ করা হল রোযার দেহ।আর রোযার রূহ হল এসব জিনিষ ত্যাগ করার পাশাপাশি সব ধরনের গুনাহর কাজ থেকে বিরত থাকা। কেননা গুনাহ থেকে বিরত থাকা ব্যতীত রোযা আল্লাহ তায়ালার নিকট কোনো মূল্য রাখে না। হাদীস শরীফে আছে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেছেন-

রোযা হচ্ছে ঢাল। সুতরাং, রোযাদার কোনো অশ্লীল কথাবার্তা বলবে না এবং মূর্খতাসূলভ কোন কাজ করবে না। কেউ যদি তাকে গালি দেয় বা তার সঙ্গে ঝগড়া বিবাদে লিপ্ত হয়, তাহলে সে যেনো বলে! আমি রোযাদার।[সহীহ বুখারী,হাদীস:১৮৯৪]।

অন্য হাদীসে আছে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেছেন-

"যে ব্যক্তি রোযা অবস্থায় মিথ্যাচার ও মন্দকাজ ত্যাগ করে নি,তার পানাহার ত্যাগে আল্লাহর কোনো প্রয়োজন নেই।[সহীহ বুখারী ১/২১৫ হাদীস নং ;১৯০৩]।

সুতরাং, অন্যান্য সময়ের মত রোযা অবস্থায়ও বিশেষ করে নিম্নোক্ত গুনাসমূহ পরত্যাগ করতে হবে। (১) হারাম সম্পদ দ্বারা সাহরী ও ইফতার করা। (২) গীবত বা পরনিন্দা করা। (৩) ঝগড়া - বিবাদ করা। (৪) ধোঁকা - প্রতারণা ও মিথ্যাচার আশ্রয় নেওয়া।

রোজার গুরুত্বঃ

রোজার গুরুত্ব :

রমজানের একটি বিশেষ গুরুত্ব/ফজিলত বা মাহাত্ম হচ্ছে, এই পবিত্র রমজান মাসে আল কোরআন অবতীর্ণ হয়েছে। রমজান মাসের রোজা মানুষকে পাপ-পঙ্কিলতা থেকে মুক্তি দেয়, মানুষের কুপ্রবৃত্তি ধুয়ে মুছে দেয় এবং আত্মাকে দহন করে ঈমানের শাখা প্রশাখা সঞ্জিবীত করে। সর্বোপরি আল্লাহ রাব্বুল আলামিনের নৈকট্য ও সন্তুষ্টি লাভ করা যায়। এই মর্মে মহানবী (সা.) ইরশাদ করেছেন,

'রোজাদারের জন্য দু'টি খুশি। একটি হলো তার ইফতারের সময়, আর অপরটি হলো আল্লাহর সঙ্গে সাক্ষাতের সময়।' (বুখারী ও মুসলিম)।

হাদিসে পাকে রমজানের রোজার আবশ্যকতা তুলে প্রিয় নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ঘোষণা করেন-
হজরত তালহা ইবনে উবায়দুল্লাহ রাদিয়াল্লাহু আনহু বর্ণনা করেন, (একবার) এলোমেলো চুলসহ এক গ্রাম্য আরব প্রিয় নবী রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি

ওয়াসাল্লামের কাছে আসলেন। অতঃপর বললেন, ‘হে আল্লাহর রাসূল! আমাকে বলুন, আল্লাহ তায়ালা আমার ওপর কত রাকাত নামাজ ফরজ করেছেন?

তিনি বললেন, ‘পাঁচ ওয়াক্ত নামাজ; তবে তুমি যদি কিছু নফল আদায় কর তবে তা স্বতন্ত্র।’
তারপর সে ব্যক্তি বলল, আমাকে বলুন, আল্লাহ আমার ওপর কত সিয়াম ফরজ করেছেন?

রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন, ‘রমজান মাসের সাওম বা রোজা; তবে তুমি যদি কিছু নফল রোজা আদায় কর তবে তা স্বতন্ত্র কথা।’

তারপর তিনি বললেন, বলুন, আল্লাহ আমার ওপর কী পরিমাণ জাকাত ফরজ করেছেন?
রাবি বলেন, ‘রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাকে ইসলামের বিধান জানিয়ে দিলেন। এরপর তিনি বললেন, ‘ওই সত্ত্বার কসম! যিনি আপনাকে সত্য নবী করে সম্মানিত করেছেন। (লোকটি বলল) আল্লাহ আমার ওপর যা ফরজ করেছেন, আমি এর মাঝে কিছু বাড়াবো না এবং কমাবোও না।

রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন, ‘সে সত্য বলে থাকলে সফলতা লাভ করবে কিংবা বলেছেন, সে সত্য বলে থাকলে জান্নাত লাভ করবে।’ (বুখারী)।

পবিত্র কোরআন এবং হাদিসের নির্দেশনা অনুযায়ী রমজান মাসব্যাপী রোজা পালন করা আল্লাহর বিধান ও ফরজ তথা আবশ্যক ইবাদত। যারা এ ইবাদত যথাযথ পালন করবে, তাদের জন্য পরকালের সফলতা তথা জান্নাত লাভ সুনিশ্চিত।

সাওম বা রোজা পৃথিবীর প্রথম নবী হজরত আদম আলাইহিস সালাম থেকে শুরু হয়ে আসছে। যার ক্রমধারা আমাদের প্রিয় নবী রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের মাধ্যমে বর্তমান সময় পর্যন্ত অব্যাহত রয়েছে।

হজরত মুজাহিদ রাহমাতুল্লাহি আলাইহি বলেছেন, এ আয়াতটি রোজা পালনকারীদের ব্যাপারে নাজিল হয়েছে।

হজরত ইয়াকুব ইবন ইউসুফ রাহমাতুল্লাহি আলাইহি বলেন, আমার কাছে এ মর্মে সংবাদ পৌঁছেছে যে, আল্লাহ তাআলা কেয়ামতের দিনে তার অলিদের (বন্ধুদের) বলবেন, হে আমার বন্ধুগণ! আমি যখনই তোমাদের দিকে তাকাতাম তখনই তোমাদের ঠোঁট খাদ্যাভাবে শুষ্ক (কুঁচকানো) দেখতাম, তোমাদের চোখ বিনিদ্র দেখতাম, পেট ক্ষুধায় কাঁপত, আজকের দিনে তোমরা তোমাদের নেয়ামতে থাকো, তোমরা পরস্পরে পেয়ালা ভরা শরাব পান করো, তোমরা তোমাদের জন্য যা আগে প্রেরণ করেছ তার বিনিময়ে তৃপ্তি সহকারে খাও ও পান করো।

হজরত হাসান রাহমাতুল্লাহি আলাইহি বলেন, নারী হুর মধুর নদীতে তার সঙ্গে হেলান দিয়ে বসা আল্লাহর বন্ধুকে বলবেন, তুমি পান পেয়ালার পানীয় গ্রহণ করো। আল্লাহ তোমার প্রতি কঠিন গরমের দিনে তাকাতেন, তুমি প্রচণ্ড তৃষ্ণা থাকা সত্ত্বেও পিপাসিত ছিলে। তখন আল্লাহ তোমাকে নিয়ে ফেরেশতাদের সঙ্গে গর্ববোধ করতেন। তিনি বলতেন, হে ফেরেশতাগণ! তোমরা আমার বান্দাকে দেখো, সে তার স্ত্রী, কামভাব, খাদ্য ও পানীয় আমার সন্তুষ্টির জন্য আমার কাছে যা কিছু আছে তার বিনিময়ে ত্যাগ করেছে। তোমরা সাক্ষ্য থাকো, আমি তাকে ক্ষমা করে দিয়েছি। তিনি সেদিনই তোমাকে ক্ষমা করে দিয়েছেন এবং আমাকে তোমার সঙ্গে বিবাহ দিয়েছেন।

রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন-

إِنَّ فِي الجَنَّةِ بَابًا يُقَالُ لَهُ الرَّيَّانُ، يَدْخُلُ مِنْهُ الصَّائِمُونَ يَوْمَ القِيَامَةِ، لاَ يَدْخُلُ مِنْهُ أَحَدٌ غَيْرُهُمْ، يُقَالُ: أَيْنَ الصَّائِمُونَ؟ فَيَقُومُونَ لاَ يَدْخُلُ مِنْهُ أَحَدٌ غَيْرُهُمْ، فَإِذَا دَخَلُوا أُغْلِقَ فَلَمْ يَدْخُلْ مِنْهُ أَحَدٌ

'জান্নাতে রাইয়্যান নামক একটি দরজা আছে। এ দরজা দিয়ে কেয়ামতের দিন রোজা পালনকারীরাই প্রবেশ করবে। তাঁদের ছাড়া আর কেউ এ দরজা দিয়ে প্রবেশ করতে পারবে না। ঘোষণা দেওয়া হবে, রোজা পালনকারীরা কোথায়? তখন তারা দাঁড়াবে। তাঁরা ছাড়া আর কেউ এ দরজা দিয়ে প্রবেশ করবে না। তাঁদের প্রবেশের পরই দরজা বন্ধ করে দেওয়া হবে। যাতে এ দরজা দিয়ে আর কেউ প্রবেশ না করে।' (বুখারি ১৮৯৬)।

রমজান মাসে রোজা পালনকারীদের জান্নাতে বিয়ে দেওয়া হয়। জান্নাতের হুরদের মহর হলো দীর্ঘ সময় ধরে তাহাজ্জুদের নামাজ। আর এ নামাজ রমজান মাসে অধিক হারে আদায় করা হয়।

কিছু রোজা পালনকারী দুনিয়াতে আল্লাহ ছাড়া সবকিছু থেকেই রোজা পালন তথা বিরত থাকে। তারা তাদের মস্তিষ্ক ও এর চিন্তাধারাকে হেফাজত করে, পেট ও পেটে যা কিছু ধরে সবকিছু সংরক্ষণ করে, মৃত্যু ও মৃত্যুপরবর্তী পরীক্ষাকে স্মরণ করে, তারা আখেরাত কামনা করে এবং দুনিয়ার সমস্ত চাকচিক্য বর্জন করে। এ ধরণের লোকদের ঈদুল ফিতর হবে তাদের রবের সাথে সাক্ষাতের দিন। তাঁকে দেখা হবে তাদের আনন্দ-উল্লাস।

রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন-

وَلَخُلُوفُ فَمِ الصَّائِمِ أَطْيَبُ عِنْدَ اللَّهِ مِنْ رِيحِ المِسْكِ

'রোজা পালনকারীর মুখের (না খাওয়াজনিত) ঘ্রাণ আল্লাহর কাছে মিসকের ঘ্রাণের চেয়েও উত্তম।' (বুখারি ১৯০৪, সহীহ মুসলিম ১১৫১)।

হজরত মাকহূল রাহমাতুল্লাহি আলাইহি বলেন, জান্নাতিগণ জান্নাতে সুঘ্রাণ পাবে। তখন তারা বলবেন, হে আমাদের রব! জান্নাতে প্রবেশের পর থেকে এত সুন্দর সুঘ্রাণ আর কখনও পাইনি। তখন তাদেরকে বলা হবে- এ হলো রোজা পালনকারীদের মুখের সুঘ্রাণ।

আল্লাহ তাআলা মুসলিম উম্মাহকে যথাযথভাবে রোজা পালন করার তাওফিক দান করুন। রোজা গুরুত্ব, ফজিলত ও মর্যাদা পাওয়ার তাওফিক দান করুন। আমিন।

রোজার বিধান

কাদের উপর রোজা ফরজঃ আট (০৮) শ্রেণি মানুষের উপর রোজা ফরজ:

১. মুসলমান হওয়া। মুসলিম ব্যক্তির জন্য রোজা রাখা ফরজ। রোজা কোন অমুসলিমের জন্যফরজনয়।

২. বালেগ হওয়া। নাবালগের ওপর রোজা ফরজ নয়।

৩. সুস্থব্যক্তি হওয়া।শারীরিক ভাবে অসুস্থ ব্যক্তির জন্য রোজা রাখার নিয়ম নাই। তবে সাধারন অসুখ বিসুখ হলে যদি সে রোজা রাখার উপযোগী হয় তবে সে রোজা রাখতে পারবে।

৪.সুস্থ মস্তিস্কের অধিকারী হওয়া।পাগলের ওপর রোজা ফরজ নয়।

৫.স্বাধীন হওয়া।পরাধীন নয় এমন ব্যক্তি হওয়া।

৬.সজ্ঞান হওয়া।অর্থাৎ যিনি রোজা রাখবেন তিনি নিজ জ্ঞানে বা স্বেচ্ছায় আল্লাহর

হুকুম পালন করবেন।

৭.মুকিম হওয়া।অর্থাৎ স্তায়ীবাসিন্দা হওয়া। মুসাফিরের ওপর রোজা ফরজের ব্যপারে একটু ভিন্নতা আছে। যেমন কষ্টসাধ্য ভ্রমন হলে পরবর্তীতে রোজা আদায়ের বিধান আছে। আমি মনে করি বর্তমানে সফর অনেক আরামের সাথে করা যায় তাই সফর অবস্থায় একমাত্র কাহিল হয়ে না পড়লে রোজা রাখা উচিৎ।

৮.তাহীরা অর্থাৎ-হায়েজ-নেফাস মুক্ত হতে হবে,এটা মহিলাদের ক্ষেত্রে। নারীর যৌনাঙ্গ থেকে কোনো কারণ ছাড়া নির্দিষ্ট সংখ্যক দিন যে রক্ত বের হয়-তাকে হায়েয বলে।

তার সর্বনিম্ন মেয়াদ ৩দিনও সর্বোচ্চ মেয়াদ১০দিন।আর সন্তান প্রসবের পর নারীর জরায়ূ থেকে যে রক্ত বের হয় তাকে নেফাস বলে। নেফাসের সর্বনিম্ম কোনো মেয়াদ নেই,তবে সর্বোচ্চ মেয়াদ৪০দিন।

রোজার রোকন: সাওমের রোকন একটি তা হলো রোজা ভঙ্গ করে এমন বস্তু পরিহার করা।

রোজার শর্তঃ রোজার তিনটি শর্ত রয়েছে। ১. রোজা ফরজ হওয়ার শর্ত ৩টি যথা- ক. মুসলমান হওয়া, ২. জ্ঞানবান হওয়া ৩. প্রাপ্ত বয়স্ক হওয়া ২. রোজা আদায় হওয়ার শর্ত ২টি- ক. সুস্থ হওয়া খ. মুকীম হওয়া। রোজা আদায় শুদ্ধ হওয়ার শর্ত ২টি ক. মহিলাদের ক্ষেত্রে মিনস ও নেফাস থেকে পবিত্র হওয়া। খ. নিয়ত করা।

রোজা ভঙ্গের কারণঃ

নির্ধারিত কিছু শর্ত ও রোকন আদায়ের মাধ্যমে রোজা সম্পন্ন করতে হয়। এসব শর্ত ও রোকন পাওয়া না গেলে রোজা ভেঙে যায় এবং তা বাতিল বলে গণ্য হয়।

শরিয়ত অনুমোদিত কারণ ছাড়া কোনো ব্যক্তির জন্য রোজা ভঙ্গ করা কবিরা গুনাহ। ইসলামী শরিয়তে রোজা ভঙ্গ করার প্রতিবিধান রাখলেও তার শতভাগ ক্ষতিপূরণ সম্ভব নয়।

আবু হুরায়রা (রা.) বলেন, রাসুলুল্লাহ (সা.) বলেছেন, 'যে ব্যক্তি (শরিয়ত অনুমোদিত) কোনো কারণ ছাড়া বা রোগ ছাড়া রমজান মাসের একটি রোজা ভেঙে ফেলে, তার পুরো জীবনের রোজা দিয়েও এর ক্ষতিপূরণ হবে না। যদিও সে জীবনভর রোজা রাখে।(সুনানে তিরমিজি, হাদিস : ৭২৩)।

রোজা ভঙ্গের ১৫ কারণ:

রোজা ভঙ্গের প্রধান তিন কারণ হলো—

১. কোনো কিছু খাওয়া। ২. কোনো কিছু পান করা। ৩. স্ত্রী সহবাস করা।

তবে এই তিনটির সঙ্গে সম্পর্কিত কিছু সূক্ষ্ম কারণেও রোজা ভেঙে যায়, যা সাধারণত আমরা খেয়াল করি না।

যেমন ৪. ভুলে খাওয়া বা পান করার পর রোজা ভেঙে গেছে মনে করে আবার ইচ্ছাকৃতভাবে খাওয়া বা পান করা। ৫. বিড়ি-সিগারেট বা হুঁকা সেবন করা। ৬. কাঁচা চাল, আটার খামির বা একত্রে অনেক লবণ খাওয়া। ৭. এমন কোনো বস্তু খাওয়া, যা সাধারণত খাওয়া হয় না। যেমন কাঠ, লোহা, কাগজ, পাথর, মাটি, কয়লা ইত্যাদি। ৮. পাথর, কাদামাটি, কংকর, তুলা-সুতা, তৃণলতা, খড়কুটো ও কাগজ গিলে ফেলা। ৯. নিজের থুতু হাতে নিয়ে গিলে ফেলা। ১০. ভুলে স্ত্রী সম্ভোগের পর রোজা ভেঙে গেছে

মনে করে আবার স্ত্রীর সঙ্গে সহবাস করা। ১১. বৃষ্টি বা বরফের টুকরো খাদ্যনালির ভেতরে চলে গেলে রোজা ভেঙে যায়। ১২. দাঁত দিয়ে রক্ত বের হলে যদি তা থুতুর চেয়ে পরিমাণে বেশি হয় এবং কণ্ঠনালিতে চলে যায়। ১৩. মুখে পান দিয়ে ঘুমিয়ে যাওয়া এবং এ অবস্থায় সুবহে সাদিক করা। ১৪. কাউকে জোরজবরদস্তি করে পানাহার করানো। ১৫. ইচ্ছাকৃতভাবে বমি করা বা বমি আসার পর তা গিলে ফেলা।

রোজা ভাঙার প্রতিবিধানঃ

যেসব কারণে রোজা ভেঙে যায় প্রতিবিধানের বিচারে তা দুই প্রকার।

এক. যার কারণে রোজা ভেঙে যায় এবং তার প্রতিবিধান হিসেবে কাজা ও কাফফারা (ক্ষতিপূরণ) উভয়টি আদায় করতে হয়। তা হলো স্ত্রী-সম্ভোগ ও ইচ্ছাকৃত পানাহার। কেউ যদি ইচ্ছা করে রমজান মাসের দিনের বেলা স্ত্রীর সঙ্গে সহবাস করে অথবা পানাহার করে, তবে তার রোজা ভেঙে যাবে। তার প্রতিবিধান হিসেবে ব্যক্তিকে রোজার কাজা ও কাফফারা করতে হবে। তবে ইমাম শাফেয়ি ও আহমদ (রহ.)-এর মত হলো, কেউ ইচ্ছা করে কিছু খেলে শুধু কাজা করবে। কাফফারা দিতে হবে না। তাদের মতে, শুধু স্ত্রী-সম্ভোগের কারণেই রোজার কাফফারা ওয়াজিব হয়।

উল্লেখ্য, ওষুধ ও ধূমপান পানাহারের অন্তর্ভুক্ত এবং স্বেচ্ছায় যেকোনো প্রকার বীর্যপাত স্ত্রী-সঙ্গমের অন্তর্ভুক্ত। কোনো স্বামী যদি স্ত্রীকে সহবাসে বাধ্য করে, তবে স্ত্রী শুধু রোজা কাজা করবে এবং স্বামীর কাজা-কাফফারা দুটোই করবে।

দুই. যেসব কারণে রোজা ভঙ্গ হলে প্রতিবিধান হিসেবে শুধু কাজা করতে হয়, কাফফারা দিতে হয় না। এমন কিছু কারণ হলো—

১. ইচ্ছা করে বমি করা,

২. বমির বেশির ভাগ মুখে আসার পর তা গিলে ফেলা,

৩. মেয়েদের মাসিক ও সন্তান প্রসবের পর ঋতুস্রাব,

৪. ইসলাম ত্যাগ করলে,

৫. গ্লুকোজ বা শক্তিবর্ধক ইনজেকশন বা সেলাইন দিলে,

৬. কুলি করার সময় অনিচ্ছায় গলার ভেতর পানি প্রবেশ করলে,

৭. প্রস্রাব-পায়খানার রাস্তা দিয়ে ওষুধ বা অন্য কিছু শরীরে প্রবেশ করালে,

৮. রোজাদারকে জোর করে কেউ কিছু খাওয়ালে,

৯. রাত অবশিষ্ট আছে মনে করে সুবেহ সাদিকের পর পানাহার করলে,

১০. ইফতারের সময় হয়েছে ভেবে সূর্যাস্তের আগে ইফতার করলে,

১১. মুখ ভরে বমি করলে,

১২. ভুলবশত কোনো কিছু খেয়ে, রোজা ভেঙে গেছে ভেবে ইচ্ছা করে আরো কিছু খেলে,

১৩. বৃষ্টির পানি মুখে পড়ার পর তা খেয়ে ফেললে,

১৪. কান বা নাক দিয়ে ওষুধ প্রবেশ করালে,

১৫. জিহ্বা দিয়ে দাঁতের ফাঁক থেকে ছোলা পরিমাণ কোনো কিছু বের করে খেয়ে ফেললে,

১৬. অল্প বমি মুখে আসার পর ইচ্ছাকৃতভাবে তা গিলে ফেললে,

১৭. রোজা স্মরণ থাকা অবস্থায় অজুতে কুলি বা নাকে পানি দেওয়ার সময় ভেতরে পানি চলে গেলে। (ফাতাওয়ায়ে শামি ও ফাতাওয়ায়ে আলমগিরি)

যেসব কারণে রোজা ভাঙলে কাযা ওয়াজিব হয়:

১. ইচ্ছাকরে মুখভর্তি বমি করা। ২. কোনো অখাদ্য বস্তু খেয়ে ফেললে। ৩. স্ত্রীকে চুম্বন বা স্পর্শ করায় বীর্যপাত হলে। ৪. কুলি করার সময় অনিচ্ছায় পানি পেটে চলে গেলে। ৫. সন্ধ্যা বিবেচনায় সূর্যাস্তের আগে ইফতার করলে। ৬. ঢুস নিলে। ৭. জোরপূর্বক রোযাদারকে কেউ পানাহার করালে। ৮. কেউ যৌনাঙ্গ ব্যতিরেকে সঙ্গম করায় তাতে

বীর্যপাত হলে। ৯. তরল ওষুধ লাগানোর কারনে তা পেটে বা মস্তিষ্কে পৌঁছে গেলে। ১০. সুবহে সাদেক মনে করে ভোরে পানাহার করলে। ১১. ঘুমন্ত অবস্থায় কিছু খেয়ে ফেললে। ১২. দাঁত থেকে ছোলা পরিমান কোনো কিছু বের করে গিলে ফেললে। ১৩. ভুলবসত কিছু খেয়ে রোযা ভঙ্গ হয়েছে ধারনা করে ইচ্ছাপূর্বক আবার খেলে।

যেসব কারণে রোযা ভাঙলে কাযা ও কাফফারা ওয়াজিব :

১. রোযা অবস্থায় ইচ্ছাপূর্বক স্ত্রী সহবাস করলে। ২. ইচ্ছাপূর্বক পুং মৈথুন ও হস্ত মৈথুন করা বীর্যপাত করলে। ৩. ইচ্ছাপূর্বক কোনো খাদ্য বা পানীয় গ্রহণ করলে। ৪. শিঙ্গা নিয়ে এ ধারনায় ইচ্ছাপূর্বক পানাহার করলে যে, এখন তো রোযা নষ্ট হয়ে গেছে।

রোজার কাজা ও কাফফারাঃ

রোজার কাজা হলো ভেঙে যাওয়া বা ভেঙে ফেলা রোজার প্রতিবিধান হিসেবে শুধু রোজা আদায় করা। অতিরিক্ত কিছু আদায় না করা। অন্যদিকে রোজার কাফফারা হলো প্রতিবিধান হিসেবে অতিরিক্ত ক্ষতিপূরণ আদায় করা। রোজার কাফফারা বিষয়ে আবু হুরায়রা (রা.) বলেন, আমরা আল্লাহর রাসুল (সা.)-এর কাছে বসা ছিলাম। এমন সময় এক ব্যক্তি এসে বলল, হে আল্লাহর রাসুল, আমি ধ্বংস হয়ে গেছি। রাসুলুল্লাহ (সা.) বললেন, তোমার কী হয়েছে? সে বলল, আমি রোজা অবস্থায় আমার স্ত্রীর সঙ্গে মিলিত হয়েছি। রাসুলুল্লাহ (সা.) বললেন, স্বাধীন করার মতো কোনো ক্রীতদাস তুমি মুক্ত করতে পারবে কি? সে বলল, না। তিনি বললেন, তুমি কি একাধারে দুই মাস সওম পালন করতে পারবে? সে বলল, না। এরপর তিনি বললেন, ৬০ জন মিসকিন খাওয়াতে পারবে কি? সে বলল, না। হাদিস বর্ণনাকারী বলেন, তখন নবী (সা.) থেমে গেলেন,

আমরাও এ অবস্থায় ছিলাম। এ সময় নবী (সা.)-এর কাছে এক 'আরাক পেশ করা হলো, যাতে খেজুর ছিল। আরাক হলো ঝুড়ি। নবী (সা.) বললেন, প্রশ্নকারী কোথায়? সে বলল, এই যে আমি। তিনি বললেন, এগুলো নিয়ে দান করে দাও। তখন লোকটি বলল, হে আল্লাহর রাসুল (সা.), আমার চেয়েও বেশি অভাবগ্রস্তকে সাদকা করব? আল্লাহর শপথ, মদিনার উভয় প্রান্তের মধ্যে আমার পরিবারের চেয়ে অভাবগ্রস্ত কেউ নেই। রাসুল (সা.) হেসে উঠলেন এবং তার দাঁত দেখা গেল। অতঃপর তিনি বললেন, এগুলো তোমার পরিবারকে খাওয়াও। ' (সহিহ বুখারি, হাদিস : **১৯৩৬**)

বেশির ভাগ ফকিহ বলেন, হাদিসে বর্ণিত ধারাবাহিকতা রক্ষা করা আবশ্যক। অর্থাৎ রোজা ভঙ্গকারী দাস মুক্ত করতে অক্ষম হলে দুই মাস রোজা রাখবে। আর দুই মাস রোজা রাখতে ব্যর্থ হলে ৬০ জন মিসকিনকে খাবার খাওয়াবে।

রোজার কাফফারার বিধানঃ

বিনা কারণে রোজা ভঙ্গ করলে তাকে অবশ্যই কাজা-কাফফারা উভয়ই আদায় করা ওয়াজিব। যতটি রোজা ভঙ্গ হবে, ততটি রোজা আদায় করতে হবে। কাজা রোজা একটির পরিবর্তে একটি অর্থাৎ রোজার কাজা হিসেবে শুধু একটি রোজাই যথেষ্ট। **কাফফারা আদায় করার তিনটি বিধান রয়েছে।**

১) একটি রোজা ভঙ্গের জন্য একাধারে ৬০টি রোজা রাখতে হবে। কাফফারা ধারাবাহিকভাবে ৬০টি রোজার মাঝে কোনো একটি ভঙ্গ হলে আবার নতুন করে শুরু করতে হবে।

২) যদি কারো জন্য ৬০টি রোজা পালন সম্ভব না হয় তবে ৬০ জন মিসকিনকে দুই বেলা খাওয়াতে হবে। কেউ অসুস্থতাজনিত কারণে রোজা রাখার ক্ষমতা না থাকলে ৬০ জন ফকির, মিসকিন, গরিব বা অসহায়কে প্রতিদিন দুই বেলা করে পেটভরে খাওয়াতে হবে। ৩) গোলাম বা দাসী আজাদ করে দিতে হবে।

যেসকল কারণে রোযা ভঙ্গ করা জায়েয

রোযা ভঙ্গের গ্রহণযোগ্য কারণ সমূহ হল:

১) অসুস্থতা,

২) সফর। পবিত্র কুরআনে বর্ণিত হয়েছে। আল্লাহ্ বলেন, وَمَنْ كَانَ مَرِيضًا أَوْ عَلَى سَفَرٍ فَعِدَّةٌ مِنْ أَيَّامٍ أُخَر "আর যে ব্যক্তি অসুস্থ হবে অথবা সফরে থাকবে (সে রোযা ভঙ্গ করে) অন্য দিনে তা কাযা আদায় করে নিবে।" (সূরা বাক্বারাঃ ১৮৫)

৩) গর্ভবতী নারীর নিজের বা শিশুর জীবনের আশংকা করলে রোযা ভঙ্গ করবে।

৪) সন্তানকে দুগ্ধদানকারীনী নারী যদি রোযা রাখলে নিজের বা সন্তানের জীবনের আশংকা করে তবে রোযা ভঙ্গ করবে।

৫) কোন বিপদগ্রস্ত মানুষকে বাঁচাতে গিয়ে রোযা ভঙ্গ করা: যেমন পানিতে ডুবন্ত ব্যক্তিকে উদ্ধার, আগুন থেকে বাঁচাতে গিয়ে দরকার হলে রোযা ভঙ্গ করা।

৬) আল্লাহ্র পথে জিহাদে থাকার সময় শরীরে শক্তি বজায় রাখার জন্য রোযা ভঙ্গ করা। কেননা নবী (ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) মক্কা বিজয়ের সময় ছাহাবীদেরকে বলেছিলেন, إِنَّكُمْ مُصَبِّحُو عَدُوِّكُمْ وَالْفِطْرُ أَقْوَى لَكُمْ فَأَفْطِرُوا। "আগামীকাল তোমরা শত্রুর মোকাবেলা করবে, রোযা ভঙ্গ করলে তোমরা অধিক শক্তিশালী থাকবে, তাই তোমরা রোযা ভঙ্গ কর।"

বৈধ কোন কারণে রোযা ভঙ্গ করলে দিনের বাকি অংশ রোযা অবস্থায় থাকা আবশ্যক নয়। কেননা সে তো গ্রহণযোগ্য ওযরের কারণেই রোযা ভঙ্গ করেছে। এজন্য এ মাসআলায় বিশুদ্ধ কথা হচ্ছেঃ কোন রোগী যদি অসুস্থতার কারণে দিনে রোযা ভঙ্গ করে আর দিন শেষ হওয়ার আগেই সুস্থ হয়ে যায়, তবে দিনের বাকি অংশ রোযা অবস্থায় থাকার কোন আবশ্যকতা নেই। কোন মুসাফির যদি রোযা ভঙ্গ অবস্থায় দিন

থাকতেই সফর থেকে ফিরে আসে তারও দিনের বাকি অংশ রোযা অবস্থায় থাকার আবশ্যকতা নেই। অনুরূপ বিধান ঋতুবতী নারীর। কেননা এরা সবাই বৈধ কারণে রোযা ভঙ্গ করেছে। তাই ঐ দিবস তাদের জন্যই। তাতে তাদের প্রতি ছিয়ামের আবশ্যকতা নেই। কেননা শরীয়ত তাদেরকে রোযা ভঙ্গের অনুমতি প্রদান করে আবার তা আবশ্যক করবে না।

এর বিপরীত মাসআলা হচ্ছে, রামাযান মাসের চাঁদ দেখা গেছে একথা যদি দিনের বেলায় প্রমাণিত হয়, তবে খবর পাওয়ার সাথে সাথে রোযার নিয়ত করে নিতে হবে এবং দিনের বাকী সময় রোযা অবস্থায় কাটাতে হবে। উভয় মাসআলায় পার্থক্য সুস্পষ্ট। কেননা যখন কিনা দিনের বেলায় রামাযান মাস শুরু হওয়ার কথা প্রমাণিত হয়েছে, তখন তাদের উপর সে দিনের ছিয়াম পালন করা ওয়াজিব হয়ে গেছে। কিন্তু না জানার কারণে তাদের ওযর গ্রহণযোগ্য এবং তাদের ছিয়াম বিশুদ্ধ। এই কারণে তারা যদি জানতে পারত যে আজ রামাযান শুরু হয়েছে, তবে রোযা রাখা তাদের জন্য আবশ্যক হত।

রোযাদারের জন্য যা জায়েয:

১. স্ত্রীর সঙ্গে স্বাভাবিক মেলামেশা করা বা চুমু দেওয়া। যদি বীর্যপাতের আশঙ্কা না থাকে। ২. গোফে তেল ব্যবহার করা। ৩. চোখে সুরমা লাগানো। ৪. মেসওয়াক করা। ৫. এমনভাবে কুলি করা যাতে পেটে পানি প্রবেশের আশঙ্কা না থাকে। ৬. সাবধানতায় নাকে পানি দেওয়া যাতে ভেতরে পানি চলে না যায়। ৭. গোসল করা। ৮. শিঙ্গা লাগানো, যদি এর দ্বারা রোজাদার দুর্বল হয়ে পড়ার আশঙ্কা না থাকে। ৯. শরীরে ঢুস ব্যবহার করা। ১০. স্বামীর অশালীন কথাবার্তা শুনার আশঙ্কা থাকলে তরকারীর স্বাদ গ্রহণ করা। ১১. মুসাফির অবস্থায় অসহ্য কষ্ট হলে রোযা ছেড়ে দেওয়া। ১২. সন্তানকে দুধ পান না করালে যদি সন্তানের স্বাস্থ্য নষ্ট হওয়ার আশঙ্কা থাকে, তবে রোযা ছেড়ে

দেয়া বৈধ: কিন্তু পরবর্তীতে কাযা আদায় করতে হবে। ১৩. প্রয়োজন মনে করলে সন্তানের মুখে খাবার চিবিয়ে দেওয়া। ১৪. অনিচ্ছাকৃত বমি করা।

রোজাদারের জন্য নাজায়েয কাজ:

১. যৌন সম্ভোগ ও হস্তমৈথুনের মাধ্যমে বীর্যপাত ঘটানো। ২. ইচ্ছাকৃত পানাহার করা।

৩. যথা খাদ্য মুখে দিয়ে স্বাদ গ্রহণ করা। ৪. শিঙ্গা লাগিয়ে রোযা নষ্ট হয়েছে মনে করে পানাহার করা। ৫. দাঁত থেকে কোনো খাদ্যকনা বের করে গিলে ফেলা। ৬. প্রয়োজন ছাড়া সন্তানের মুখে খাদ্য চিবিয়ে দেওয়া। ৭. মিথ্যা বলা, অশ্লীল কথা বা গালিগালাজ করা। ৮. ভুলক্রমে কিছু পানাহার শুরু করে রোযা ভঙ্গ হয়েছে মনে করে পেট পুরে পানাহার করা। ৯. সারাদিন রোযা শেষে ইফতারের সময় ইফতার না করা।

রোজা মাকরূহ হওয়ার কারণ:

১. গড়গড়িয়ে কুলি করা। কেননা এতে পেটে পানি প্রবেশের আশঙ্কা থাকে।

২. শরীরে তেল ব্যবহার করা। কেননা এত পশমের গোড়া দিয়ে তেল শরীরের অভ্যন্তরে ঢুকতে পারে। ৩. শিঙ্গা লাগানো। ৪. স্ত্রীকে চুম্বন করা। কেননা অনেক সময় এটা রোযাদারকে সঙ্গমের প্রতি ধাবিত করে। ৫. দাঁত থেকে বের করে কিছু চিবিয়ে খাওয়া। ৬. মিথ্যা কথা বলা। কেননা হাদিসে এসেছে মিথ্যা সকল পাপের মূল। ৭. অশ্লীল কথাবার্তা বলা। ৮. কাউকে গালি দেওয়া। ৯. অন্যের দোষ ত্রোটি বর্ণনা করা। ১০. মুখ দিয়ে কোনো ব‍ু‘র স্বাদ গ্রহণ করা। ১১. গরম বা রোদে বারবার কুলি করা। ১২. অধিক উষ্ণতার কারণে গায়ে ভেজা কাপড় জড়িয়ে রাখা।

সাহরি খাওয়ার বিধান:

রোজা রাখার নিয়তে শেষ রাতে বরকত লাভের জন্য কিছু খাওয়াকে সাহরি বলা হয়। সাহরি খাওয়া রাসুল (সা.) এর একটি সুন্নত। রাসুল (সা.) এর হাদীস শরীফে সাহরি খাওয়ার ব্যাপারে উৎসাহিত করা হয়েছে। হজরত আনাস (র:) হতে বর্ণিত, রাসুল (সা.) বলেন, 'তোমরা সাহরি খাও, কেননা তাতে বরকত রয়েছে'। (বোখারী: ১৯২৩) রোজাদারের জন্য বরকতময় খাবার হল সাহরি খাওয়া। সাহরি খাওয়া সুন্নত। কোন কারণে সাহরি খেতে না পারলে সাহরি খাওয়া ছাড়াই রোযার নিয়ত করবেন। এতে রোজার ক্ষতি হবে না। অর্ধ রাতের পর থেকে সুবহে সাদিকের পূর্ব পর্যন্ত যে কোনো সময়ে সাহরি খাওয়া হলে সুন্নত আদায় হয়ে যাবে। শেষ রাতে সাহরি খাওয়াই উত্তম। রাসুল (সা.) সাধারণত দেরি করে সাহরি খেতেন, তাই রাতের শেষ প্রহরে সাহরি খাওয়া সুন্নাত। রাসুল (স.) বলেন, 'আমার উম্মত কল্যাণের সাথে থাকবে যতদিন তারা তাড়াতাড়ি ইফতারি করবে এবং সাহরি দেরি করে করবে'। (আহমদ)

ইফতারের বিধান:

ইফতার শব্দের অর্থ ভঙ্গ করা বা ভেঙ্গে ফেলা। আমিমুল ইহসান (র:) বলেন, রোজাদারের জন্য ইফতার হল তার পানাহার করা। শরীয়তের পরিভাষায় সারাদিন রোজা পালন শেষে সূর্যাস্ত হওয়ার পর পর পানি, শরবত, খেজুরসহ প্রয়োজনীয় খাবারের মাধ্যমে রোজা ভঙ্গ করাকে ইফতার বলা হয়। রাসুল (সা.) বলেন, রোজাদারের জন্য দুইটি আনন্দময় মুহূর্ত রয়েছে ১. ইফতারের সময় ২. আখারাতে আল্লাহর সাথে সাক্ষাতের সময়'। (বোখারী ও মুসলিম) ইফতার খেজুর দিয়ে করা সুন্নাত। আবু ইয়ালা (রহ.) বলেন, "রাসুল (সাঃ) তিনটি খেজুর দিয়ে ইফতার করতেন। খেজুর ব্যতিত অন্যান্য ফলমূল দ্বারা ইফতার করা যাবে তবে খেজুর দ্বারা ইফতার করা ভাল। রাসুল

(সাঃ) বলেন, "তোমাদের কেউ যখন ইফতার করে সে যেন খেজুর দিয়ে করে কেননা তা বরকতময় যদি খেজুর না থাকে তবে পানি দিয়ে কেননা তা পবিত্র"। (আবু দাউদ, ২৩৫৬-পৃষ্ঠা)

ইফতারির পূর্বে রোজাদারের দোয়া মহান আল্লাহ তায়ালা কবুল করেন। হজরত ওমর (রাঃ) হতে বর্ণিত রাসুল (সাঃ) বলেন, " ইফতারির সময় রোজাদারের দোয়া কবুল করা হয়। তাই ইফতারির সময় দোয়া পড়তে হয় "আল্লাহুম্মা লাকা ছুমতু ওয়াআলা রিযকিকা আফতারতু"। (আবু দাউদ)

তারাবির বিধান:

তারাবি পড়া সুন্নতে মুয়াক্কাদাহ আর তারাবির নামাজ জামাতে পড়া সুন্নতে মুয়াক্কাদায়ে কিফায়া। যে ব্যক্তি পরে যোগ দেয়ার কারণে কিছু তারাবিহ রয়ে গেছে তিনি ইমামের সাথে বিতর পরে নিবেন, অতপর অবশিষ্ট তারাবির নামাজ আদায় করবেন। অপ্রাপ্ত বয়স্ক ছেলেকে হাফেজ হোক বা না হোক ইমাম বানানো ঠিক নয়। বালেগ ইমামের পিছনে নামাজ আদায় করতে হবে। যে তারাবি পড়াবে তার নিকট থেকে আয়াতের অর্থ কিংবা সারসংক্ষেপ জেনে নেওয়া ভাল। যখন থেকে সাহাবিরা এই পড়া শুরু করেন তখন থেকে তারা দুই সালামের পর অর্থাৎ চার রাকাত নামাজের পর বিশ্রাম নিতেন। তাই এই নামাজের নাম তারাবি নামাজ করা হয়েছে। (ফতহুল বারী)

মহিমান্বিত রাত লাইলাতুল কদর

লাইলাতুল কদরঃ

‘শবে কদর’ কথাটি ফারসি। শব মানে রাত বা রজনী আর কদর মানে সম্মান, মর্যাদা, গুণাগুণ, সম্ভাবনা, ভাগ্য ইত্যাদি। তাই এই রাতটি মুসলমানদের জন্য ভাগ্য রজনী হিসেবে সম্মানিত।

শবে কদর অর্থ হলো মর্যাদাপূর্ণ রাত বা ভাগ্যরজনী। শবে কদরের আরবি হলো লাইলাতুল কদর তথা সম্মানিত রাত। লাইলাতুল কদরের রাত হচ্ছে হাজার মাসের চেয়ে উত্তম রাত।

পবিত্র কুরআনুল কারিম নাযিলের মাধ্যমে আল্লাহ রাব্বুল আলামীন এই রাতকে হাজারের মাসের চেয়ে শ্রেষ্ঠ উত্তম ও মহা সম্মানিত রাত হিসেবে আমারদের জন্য দান করেছেন। প্রতিবছর রমজান মাসের শেষ দশকের রাতগুলোর মধ্যে কোনো এক বিজোড় রাত হলো ভাগ্য নির্ধারণ বা লাইলাতুল কদরের রাত।

যে রাতে পবিত্র কুরআন নাজিল হয়েছে, সে রাতই লাইলাতুল কদর। আল্লাহ তায়ালা বলেন: ‘নিশ্চয়ই আমি কুরআন নাজিল করেছি মর্যাদাপূর্ণ কদর রজনীতে। আপনি কি জানেন, মহিমাময় কদর রজনী কী? মহিমান্বিত কদর রজনী হাজার মাস অপেক্ষা উত্তম। সে রাতে ফেরেশতাগণ হজরত জিবরাইল আলাইহিস সালামকে সমভিব্যহারে অবতরণ করেন; তাঁদের প্রভু মহান আল্লাহর নির্দেশ ও অনুমতিক্রমে, সব বিষয়ে শান্তির বার্তা নিয়ে। এই শান্তির ধারা চলতে থাকে উষা বা ফজর পর্যন্ত। (আল কুরআন, সুরা-৯৭ [২৫] আল কদর)।

লাইলাতুল কদরের মর্যাদা, বৈশিষ্ট্য ও ফযীলতঃ

(১) এ রাতে আল্লাহ তা'আলা পুরা কুরআন কারীমকে লাউহে মাহফুয থেকে প্রথম আসমানে নাযিল করেন। তাছাড়া অন্য আরেকটি মত আছে যে, এ রাতেই কুরআন নাযিল শুরু হয়। পরবর্তী ২৩ বছরে বিভিন্ন সূরা বা সূরার অংশবিশেষ বিভিন্ন সময়ে বিভিন্ন ঘটনা ও অবস্থার প্রেক্ষিতে রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম'র উপর অবতীর্ণ হয়।

(২) এ এক রজনীর ইবাদত হাজার মাসের ইবাদতের চেয়েও উত্তম।

(৩) এ রাতে পৃথিবীতে অসংখ্য ফেরেশতা নেমে আসে এবং তারা তখন দুনিয়ার কল্যাণ, বরকত ও রহমাত বর্ষণ করতে থাকে।

(৪) এটা শান্তি বর্ষণের রাত। এ রাতে ইবাদত গুজার বান্দাদেরকে ফেরেশতারা জাহান্নামের আযাব থেকে মুক্তির বাণী শুনায়।

(৫) এ রাতের ফাযীলত বর্ণনা করে এ রাতেই একটি পূর্ণাঙ্গ সূরা নাযিল হয়। যার নাম সূরা কদর।

(৬) এ রাতে নফল সালাত আদায় করলে মুমিনদের অতীতের সগীরা গুনাহগুলো মাফ করে দেয়া হয়।

রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন,

مَنْ قَامَ لَيْلَةُ الْقَدْرِ إِيْمَانًا وَّاحْتِسَابًا غُفِرَ لَهُ مَا تَقَدَّمَ مِنْ ذَنْبِهِ

অর্থ : যে ব্যক্তি ঈমান ও সাওয়াব লাভের আশায় কদরের রাতে নফল সালাত আদায় ও রাত জেগে ইবাদত করবে আল্লাহ তার ইতোপূর্বের সকল সগীরা (ছোট) গুনাহ ক্ষমা করেদেন। (বুখারী : ১৯০১; মুসলিম : ৭৬০)।

কোন রাতটি লাইলাতুল কদর?

এ প্রশ্নের উত্তর স্বরূপ হাদীসে নিম্নবর্ণিত বাণী রয়েছে :

[১] এ রাতটি রমযান মাসে। আর এ রাতের ফযীলত কিয়ামত পর্যন্ত জারী থাকবে।

[২] এ রাতটি রমাযানের শেষ দশকে। রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন :

تَحَرُّوْا لَيْلَةَ الْقَدْرِ فِي الْعَشْرِ الأوَاخِرِ مِنْ رَمَضَانَ

"রমাযানের শেষ দশদিনে তোমরা কদরের রাত তালাশ কর।" (বুখারী : ২০২০; মুসলিম : ১১৬৯)।

[৩] আর এটি রমযানের বেজোড় রাতে হওয়ার সম্ভাবনা বেশি। রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন :

تَحَرُّوْا لَيْلَةُ الْقَدْرِ فِي الْوِتْرِ مِنَ الْعَشْرِ الأَوَاخِرِ مِنْ رَمَضَانَ

"তোমরা রমাযানের শেষ ১০ দিনের বেজোড় রাতগুলোতে কদরের রাত খোঁজ কর।" (বুখারী : ২০১৭)।

[৪] এ রাত রমযানের শেষ সাত দিনে হওয়ার সম্ভাবনা বেশি। রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন :

فَمَنْ كَانَ مُتَحَرِّيْهَا فَلْيَتَحَرِّهَا فِي السَّبْعِ الأَوَاخِرِ

"যে ব্যক্তি লাইলাতুল কদর (কদরের রাত) অন্বেষণ করতে চায়, সে যেন রমাযানের শেষ সাত রাতের মধ্য তা অন্বেষণ করে।" (বুখারী : ২০১৫; মুসলিম : ১১৬৫)।

[৫] রমাযানের ২৭ শে রজনী লাইলাতুল কদর হওয়ার সম্ভাবনা সবচেয়ে বেশি।

ক. উবাই ইবনে কাব হতে বর্ণিত হাদীসে এসেছে, তিনি বলেন যে,

وَاللهِ إِنِّيْ لأَعْلَمُ أَيُّ لَيْلَةٍ هِيَ اللَّيْلَةُ الَّتِيْ أَمَرَنَا رَسُوْلُ اللهِ -صلى الله عليه وسلم- بِقِيَامِهَا هِىَ لَيْلَةُ سَبْعٍ وَعِشْرِيْنَ

আল্লাহর শপথ করে বলছি, আমি যতদূর জানি রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আমাদেরকে যে রজনীকে কদরের রাত হিসেবে কিয়ামুল্লাইল করতে নির্দেশ দিয়েছিলেন তা হল রমাযানের ২৭ তম রাত। (মুসলিম : ৭৬২)।

(খ) আব্দুল্লাহ বিন 'উমার থেকে বর্ণিত, রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন :

مَنْ كَانَ مُتَحَرِّيْهَا فَلْيَتَحَرَّهَا لَيْلَةَ السَّبْعِ وَالْعِشْرِيْنَ

"যে ব্যক্তি কদরের রাত অর্জন করতে ইচ্ছুক, সে যেন তা রমাযানের ২৭শে রজনীতে অনুসন্ধান করে। (আহমাদ : ২/১৫৭)।

[৬] কদরের রাত হওয়ার ব্যাপারে সম্ভাবনার দিক থেকে পরবর্তী দ্বিতীয় সম্ভাবনা হল ২৫ তারিখ, তৃতীয় হল ২৯ তারিখে। চতুর্থ হল ২১ তারিখ। পঞ্চম হল ২৩ তারিখের রজনী।

[৭] সর্বশেষ আরেকটি মত হল- মহিমান্বিত এ রজনীটি স্থানান্তরশীল। অর্থাৎ প্রতি বৎসর একই তারিখে বা একই রজনীতে তা হয় না এবং শুধুমাত্র ২৭ তারিখেই এ রাতটি আসবে তা নির্ধারিত নয়। আল্লাহর হিকমত ও তাঁর ইচ্ছায় কোন বছর তা ২৫ তারিখে, কোন বছর ২৩ তারিখে, কোন বছর ২১ তারিখে, আবার কোন বছর ২৯ তারিখেও হয়ে থাকে।

এ রাতকে অস্পষ্ট করে গোপন রাখা /নির্দিষ্ট করে না বলার কারণঃ

এ রাতের পুরস্কার লাভের আশায় কে কত বেশি সক্রিয় অগ্রণী ভূমিকা পালন করে এবং কত বেশি সচেষ্ট হয়, আর কে নাফরমান ও আলসে ঘুমিয়ে রাত কাটায় সম্ভবতঃ এটা পরখ করার জন্যই আল্লাহ তা'আলা এ রাতকে গোপন ও অস্পষ্ট করে রেখেছেন।

লাইলাতুল কদরের রাত বুঝার আলামতঃ

হ্যাঁ, সে রাতের কিছু আলামত হাদীসে বর্ণিত আছে। সেগুলো হল :

(১) রাতটি গভীর অন্ধকারে ছেয়ে যাবে না।

(২) নাতিশীতোষ্ণ হবে। অর্থাৎ গরম বা শীতের তীব্রতা থাকবে না।

(৩) মৃদুমন্দ বাতাস প্রবাহিত হতে থাকবে।

(৪) সে রাতে ইবাদত করে মানুষ অপেক্ষাকৃত অধিক তৃপ্তিবোধ করবে।

(৫) কোন ঈমানদার ব্যক্তিকে আল্লাহ স্বপ্নে হয়তো তা জানিয়েও দিতে পারেন।

(৬) ঐ রাতে বৃষ্টি বর্ষণ হতে পারে।

(৭) সকালে হালকা আলোকরশ্মিসহ সূর্যোদয় হবে। যা হবে পূর্ণিমার চাঁদের মত। (সহীহ ইবনু খুযাইমাহ: ২১৯০; বুখারী: ২০২১; মুসলিম: ৭৬২)।

রমাযানের শেষ দশ রাতে রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইবাদতঃ

রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইবাদতের অবস্থা ছিল নিম্নরূপ :

১. প্রথম ২০ রাত রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম পূর্ণ রাত জাগরণ করতেন না। কিছু সময় ইবাদত করতেন, আর কিছু অংশ ঘুমিয়ে কাটাতেন। কিন্তু রমাযানের শেষ দশ রাতে তিনি বিছানায় একেবারেই যেতেন না। রাতের পুরো অংশটাই ইবাদত করে কাটাতেন।

সে সময় তিনি কুরআন তিলাওয়াত, সালাত আদায় সদাকা প্রদান, যিকর, দু'আ, আত্মসমালোচনা ও তাওবাহ করে কাটাতেন। আল্লাহর রহমাতের আশা ও তার গজবের ভয়ভীতি নিয়ে সম্পূর্ণ খুশুখুজু ও বিনম্রচিত্তে ইবাদতে মশগুল থাকতেন।

২. হাদীসে এসেছে সে সময় তিনি শক্ত করে তার লুঙ্গি দ্বারা কোমর বেধে নিতেন। এর অর্থ হল, রাতগুলোতে। তাঁর সমস্ত শ্রম শুধু ইবাদতের মধ্যেই নিমগ্ন ছিল। নিজে যেমন অনিদ্রায় কাটাতেন তাঁর স্ত্রীদেরকেও তখন জাগিয়ে দিতেন ইবাদত করার জন্য।

৩. কদরের রাতের ইবাদতের সুযোগ যাতে হাতছাড়া হয়ে না যায় সেজন্য রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম শেষ দশদিনের পুরো সময়টাতে ইতেকাফরত থাকতেন। (মুসলিম: ১১৬৭)।

মহিমান্বিত লাইলাতুল কদরে আমরা যেসকল ইবাদত করতে পারিঃ

রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম যেভাবে এ রাত কাটাতেন এর পূর্ণ অনুসরণ করাই হবে আমাদের প্রধান লক্ষ্য। এ লক্ষ্যে আমাদের নিম্নবর্ণিত কাজগুলো করা আবশ্যক :

(ক) নিজে রাত জেগে ইবাদত করা এবং নিজের অধীনস্ত ও অন্যদেরকেও জাগিয়ে ইবাদতে উৎসাহ প্রদান করা।

(খ) লম্বা সময় নিয়ে তারাবীহ ও তাহাজ্জুদ পড়া। এসব সালাতে কিরাআত ও রুকু-সিজদা লম্বা করা। রুকু থেকে উঠে এবং দুই সিজদায় মধ্যে আরো একটু বেশি সময় অতিবাহিত করা, এসময় কিছু দু'আ আছে সেগুলে পড়া।

(গ) সিজদার মধ্যে তাসবীহ পাঠ শেষে দু'আ করা। কেননা সিজদাবনত অবস্থায় মানুষ তার রবের সবচেয়ে নিকটে চলে যায়। ফলে তখন দু'আ কবুল হয়।

(ঘ) বেশি বেশি তাওবা করবে আস্তাগফিরুল্লাহ পড়বে। ছগীরা কবীরা গোনাহ থেকে মাফ চাইবে। বেশি করে শির্কী গোনাহ থেকে খালেছ ভাবে তাওবা করবে। কারণ ইতিপূর্বে কোন শির্ক করে থাকলে নেক আমল তো কবুল হবেই না, বরং অর্জিত অন্য ভাল আমলও বরবাদ হয়ে যাবে। ফলে হয়ে যাবে চিরস্থায়ী জাহান্নামী।

(ঙ) কুরআন তিলাওয়াত করবে। অর্থ ও ব্যাখ্যাসহ কুরআন অধ্যয়নও করতে পারেন। তাসবীহ তাহলীল ও যিকর-আযকার করবেন। তবে যিকর করবেন চুপিসারে, নিরবে ও একাকী এবং কোন প্রকার জোরে আওয়ায করা ছাড়া। এভাবে যিকর করার জন্যই আল্লাহ কুরআনে বলেছেন :

﴿ وَٱذۡكُر رَّبَّكَ فِي نَفۡسِكَ تَضَرُّعٗا وَخِيفَةٗ وَدُونَ ٱلۡجَهۡرِ مِنَ ٱلۡقَوۡلِ بِٱلۡغُدُوِّ وَٱلۡأٓصَالِ وَلَا تَكُن مِّنَ ٱلۡغَٰفِلِينَ ٢٠٥ ﴾ [الاعراف: ٢٠٥]

''সকাল ও সন্ধ্যায় তোমার রবের যিকর কর মনে মনে বিনয়ের সঙ্গে ভয়ভীতি সহকারে এবং জোরে আওয়াজ না করে। এবং কখনো তোমরা আল্লাহর যিকর ও স্মরণ থেকে উদাসীন হয়োনা।'' (আরাফ : ২০৫)।

অতএব, দলবেধে সমস্বরে জোরে জোরে উচ্চ স্বরে যিকর করা বৈধ নয়। এভাবে সম্মিলিত কোন যিকর করা কুরআনেও নিষেধ আছে নবীজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ও তা করেন নি। যিকরের শব্দগুলো হল: সুবহানাল্লাহ, আলহামদুলিল্লাহ, লা-ইলাহা ইল্লাল্লাহ, আল্লাহু আকবার ইত্যাদি।

(চ) একাগ্রচিত্তে দু'আ করা। বেশি বেশি ও বারবার দু'আ করা। আর এসব দু'আ হবে একাকী ও বিনম্র চিত্তে কবুল হওয়ার প্রত্যাশা নিয়ে। দু'আ করবেন নিজের ও আপনজনদের জন্য. জীবিত ও মৃতদের জন্য, পাপমোচন ও রহমত লাভের জন্য,

দুনিয়ার শান্তি ও আখিরাতের মুক্তির জন্য। তাছাড়া নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এ রাতে নিম্নের এ দু'আটি বেশি বেশি করার জন্য উৎসাহিত করেছেন :

اَللَّهُمَّ إِنَّكَ عَفُوٌّ تُحِبُّ الْعَفْوَ فَاعْفُ عَنِّيْ

"হে আল্লাহ! তুমি তো ক্ষমার আধার, আর ক্ষমা করাকে তুমি ভালবাসো। কাজেই তুমি আমাকে ক্ষমা করে দাও। (তিরমিযী : ৩৫১৩)।

(ছ) বেশি বেশি দান-সদকা করা।

প্রস্তুতি কী আছে ফিরে আসা সেই মহান মাসের ? যে মাস পবিত্র কুরআন নাজিলের মাস, যে মাস গুনাহ মাফের মাস, যে মাস দুয়া কবুল করার মাস, যে মাস আল্লাহর সন্তুষ্টি অর্জনের মাস। যে মাস প্রতি বছর আসে পাপ-পঙ্কিলতায় জর্জরিত মানব জাতিকে সীমাহীন রহমতের ছায়ায় চির শান্তির আবাস জান্নাতে প্রবেশ করিয়ে দিতে। যে মাস আল্লাহ রাব্বুল আলামীনের রহমত ও বরকতের প্লাবনের মাস। যে মাস মাগফিরাতের মাস। আরো রয়েছে উম্মতে মুহাম্মদীর জন্য মহান আল্লাহর রমতের উপহারের রজনী যাকে লাইলাতুল ক্বদর বলা হয়। যে রাতে কুরআনুল কারিম নাযিল হয়েছিল। আল্লাহপাক বলেন,

لَيْلَةُ الْقَدْرِ خَيْرٌ مِّنْ أَلْفِ شَهْرٍ

লাইলাতুল কদর হল হাজার মাস অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ। (সূরা কদর ৩)

◉ হজরত আবূ হুরায়রা রাদিয়াল্লাহু আনহু থেকে বর্নিত, রসুলুল্লাহ (ﷺ) বলেছেন, যে ব্যাক্তি লাইলাতুল ক্বাদরে ঈমানের সাথে সওয়াবের আশায় রাত জেগে ইবাদাত করে, তাঁর পিছনের সমস্ত গুনাহ মাপ করা হবে। আর যে ব্যাক্তি ঈমানসহ সওয়াবের আশায়

রমযানে সিয়াম পালন করবে, তাঁরও অতীতের সমস্ত গুনাহ মাফ করা হবে। (সহীহ বুখারি)।

এতেকাফ

এতেকাফের সংজ্ঞাঃ

এতেকাফ الْعَكْفُ ধাতু হ'তে উৎপন্ন। যা বাবে ইফতি'আল-এর মাছদার। অর্থ : নিজেকে কোন স্থানে বদ্ধ রাখা। শারঈ পরিভাষায় আল্লাহর সান্নিধ্য লাভের উদ্দেশ্যে নিজেকে মসজিদে ইবাদত ও তেলাওয়াতের মধ্যে বদ্ধ রাখাকে এতেকাফ বলা হয়।[1] আর যে ব্যক্তি এভাবে আবদ্ধ থেকে মসজিদে ইবাদত-বন্দেগীতে লিপ্ত থাকে তাকে বলা হয় মু'তাকিফ (معتكف) বা আকিফ (عاكف)।

বিশেষ নিয়তে বিশেষ অবস্থায় আল্লাহ তা-আলার আনুগত্যের উদ্দেশ্যে মসজিদে অবস্থান করাকে এতেকাফ বলে।

এতেকাফের শারঈ বিধান :

এতেকাফ (الإعتكاف) শরী'আত নির্দেশিত একটি ইবাদত। আল্লাহ তা'আলা বলেন, وَعَهِدْنَا إِلَى إِبْرَاهِيمَ وَإِسْمَاعِيلَ أَنْ طَهِّرَا بَيْتِيَ لِلطَّائِفِيْنَ وَالْعَاكِفِيْنَ وَالرُّكَّعِ السُّجُود- 'আর আমরা ইবরাহীম ও ইসমাঈলের কাছে নির্দেশ পাঠিয়েছিলাম এই মর্মে যে, তোমরা আমার গৃহকে তাওয়াফকারীদের জন্য, এখানে অবস্থানকারীদের জন্য এবং রুকূকারী ও সিজদাকারীদের জন্য পবিত্র রাখো' (বাক্বারাহ ২/১২৫)। উল্লেখিত আয়াত দ্বারা প্রতীয়মান হয় যে, ই'তিকাফের বিধান শরী'আত সিদ্ধ ও প্রাচীন। বিধায় আল্লাহ তা'আলা ইবরাহীম (আঃ) ও ইসমাঈল (আঃ)-কে এতেকাফকারীদের জন্য আল্লাহর ঘরকে পাক-পবিত্র রাখতে বলেছেন।

নবী করীম (ছাঃ) প্রতি বছর দশ দিন এতেকাফ করেন। এমনকি যে বছর তিনি মৃত্যুবরণ করেন, সে বছর তিনি বিশ দিন এতেকাফ করেন। আবু হুরায়রা (রাঃ) হ'তে বর্ণিত, তিনি বলেন, يَعْتَكِفُ فِىْ كُلِّ رَمَضَانَ عَشْرَةَ أَيَّامٍ، فَلَمَّا كَانَ الْعَامُ الَّذِىْ قُبِضَ فِيهِ اعْتَكَفَ عِشْرِيْنَ يَوْمًا، 'রাসূল (ছাঃ) প্রতি রামাযান মাসে দশ দিন এতেকাফ করতেন। যে বছর তিনি মৃত্যুবরণ করেন সে বছর বিশ দিন এতেকাফ করেন'।

এতেকাফের প্রকারভেদঃ

ইসলামী শরীয়তে এতেকাফ ৩ প্রকার।

(ক) ওয়াজিব এতেকাফ : ওলামায়ে কেরামের ঐকমত্যে ওয়াজিব ই'তিকাফ হলো মানতের এতেকাফ। আল্লাহ তা'আলা বলেন,

﴿ وَلۡيُوفُواْ نُذُورَهُمۡ ... ٢٩ ﴾ [الحج: ٢٩]

অর্থাৎ ''তারা যেন তাদের মানৎ পূর্ণ করে।'' (সূরা হাজ্জ : ২৯)।

(খ) সুন্নাত এতেকাফ : রমযানের শেষ ১০ দিনের এতেকাফ। সুন্নাতে মুয়াক্কাদা। যেমন :

كَانَ رَسُوْلُ اللهِ -صلى الله عليه وسلم- يَعْتَكِفُ الْعَشْرِ الأَوَاخِرِ مِنْ رَمَضَانَ

'রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম রমযানে শেষ দশদিন এতেকাফ করতেন।' (বুখারী : ২০২৫; মুসলিম : ১১৭২)।

(গ) মুস্তাহাব এতেকাফ : উল্লেখিত দু'প্রকার ব্যতীত বাকী সব মুস্তাহাব এতেকাফ।

এতেকাফের স্থান : মসজিদেই এতকাফ করতে হবে। কেননা আল্লাহ তা'আলা বলেন, وَلَا تُبَاشِرُوْهُنَّ وَأَنْتُمْ عَاكِفُوْنَ فِي الْمَسَاجِدِ- 'আর যতক্ষণ তোমরা এতকাফ

অবস্থায় মসজিদে অবস্থান কর, ততক্ষণ পর্যন্ত স্ত্রীদের সাথে মেলামেশা কর না' *(বাক্বারাহ ২/১৮৭)*।

রাসূল (ছাঃ) মসজিদে এতকাফ করতেন। তদ্রূপ তাঁর স্ত্রীগণ মসজিদে এতকাফ করেছিলেন। আয়েশা (রাঃ) বলেন, كَانَ النَّبِيَ النَّبِىُّ صَلَّ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم يُصْغِى اِلَى رَاسِهِ وَهُوَ مُجَاوِرُ فِى الْمَسْجِدِ فَأَرَجِّلُهُ وَاَنَا حَائِض، 'মসজিদে এতকাফরত অবস্থায় নবী করীম (ছাঃ) আমার দিকে তাঁর মাথা ঝুঁকিয়ে দিতেন আর আমি ঋতুবতী অবস্থায় তাঁর চুল আঁচড়িয়ে দিতাম'।

যে কোন মসজিদে এতকাফ করা জায়েয।[10] কেননা আল্লাহ তা'আলা সাধারণভাবে (فِى المَسَاجِد) 'মসজিদ সমূহে' *(বাক্বারাহ ২/১৮৭)* উল্লেখ করেছেন। আব্দুল্লাহ ইবনু আববাস এবং হাসান (রাঃ) হ'তে বর্ণিত হাদীছে এসেছে যে, ছালাত (তথা জামা'আত) হয়, এরূপ মসজিদ ব্যতীত এতকাফ হবে না।

এতকোফের গুরুত্ব ও তাৎপর্যঃ

ইসলামে এতেকাফের গুরুত্ব অপরিসীম। আল্লাহ তা'আলা পবিত্র কুরআনে বলেন,'আর আমি ইবরাহিম ও ইসমাঈল (আঃ)কে নির্দেশ দিলাম যে, আমার ঘরকে তাওয়াফকারী এতেকাফকারীদের জন্য পবিত্র কর।'(সূরা বাকারা- **১২৫**)।

অপর আয়াতে আল্লাহ পাক বলেন-

'তোমরা স্ত্রীদের সাথে মেলা-মেশা করো না যখন তোমরা মসজিদে এতেকাফ কর। ' (সূরা বাকারা - **১৮৭**)।

অন্তরকে একমাত্র আল্লাহর প্রতি মনোনিবেশ করার জন্য এতেকাফ এক চমৎকার প্রশিক্ষণ। সুন্নাতসম্মত পন্থায় দুনিয়া বিরাগী হওয়ার এবং লাইলাতুল কদর তালাশ

করার ক্ষেত্রে এতেকাফ এর বিকল্প নেই। রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম প্রতি বছর রমজান মাসে এতেকাফ করতেন।

আর উম্মতের জন্য রমজানের শেষ দশকে এতেকাফ করা সুন্নাতে মুআক্কাদায়ে কিফায়া। যদি কোন মহল্লা থেকে একজন ব্যক্তি আদায় করে তাহলে সকলের পক্ষ থেকে আদায় হয়ে যাবে। কিন্তু যদি মহল্লার কেউ আদায় না করে তাহলে সকলেই গুনাহগার হবে।

একাধিক হাদিসে এসেছে -

عن عائشة رضي الله عنها، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: تحروا ليلة القدر في الوتر، من العشر الاواخر من رمضان.

'হযরত আয়েশা রা. থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, তোমরা রমজানের শেষ দশকের বিজোড় রাতে লাইলাতুল ক্বদর তালাশ কর।' (বুখারী শরীফ, হাদিস নং ১০৭২)।

عن عائشة رضي الله عنها زوج النبي صلى الله عليه وسلم، أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يعتكف العشر الاواخر من رمضان حتى توفاه الله، ثم اعتكف أزواجه من بعده.

'রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম -এর স্ত্রী আম্মাজান হযরত আয়েশা রা. হতে বর্ণিত, রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম রমজানের শেষ দশকে এতেকাফ করতেন। (বুখারী শরীফ, হাদিস নং - ১৯৮১)।

অন্য হাদিসে এসেছে,

عن عائشة رضي الله عنها قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذ دخل العشر أحيا الليل و أيقظ أهله وجد و شد المءزر.

' হযরত আয়েশা রা. থেকে বর্ণিত তিনি বলেন, রমযানের শেষ দশক শুরু হওয়ার সাথে সাথে রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম সারারাত জেগে থাকতেন ও নিজ পরিবারের সদস্যদের ঘুম থেকে জাগাতেন এবং তিনি নিজেও ইবাদতের জোড় প্রস্তুতি নিতেন। (সহিহ মুসলিম, বাবুল ই'তিকাফ)।

عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: كان النبي صلى الله عليه وسلم يعتكف في العشر الأواخر من رمضان، فلم يعتكف عاما، فلما كان في العام المقتل اعتكف عشرين.

'হযরত আনাস ইবনে মালিক রা. থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন নবি করিম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম রমজান মাসের শেষ দশ দিন এতেকাফ করতেন। কিন্তু এক বছর তিনি এতেকাফ করলেন না। তাই পরবর্তী বছর তিনি এতেকাফ করলেন। (তিরমিযি শরীফ, হাদিস নং - ১০৭২)।

عن ابي هريرة رضي الله عنه قال: كان النبي صلى الله عليه وسلم يعتكف في كل رمضان عشرة أيام، فلما كان العام الذي قبض فيه اعتكف عشرين يوما.
'হযরত আবু হুরায়রা রা. হতে বর্ণিত তিনি বলেন, রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম প্রতি বছর দশ দিন ইতিকাফ করতেন। অতঃপর যে বছর তিনি ইন্তেকাল করেন সে বছর বিশ দিন এতেকাফ করেন। (বুখারী শরীফ, হাদিস নং - ১৯৯৭)

عن عبدالله بن عمر رضي الله عنهما قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يعتكف العشر الاواخر من رمضان.

'হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে ওমর রা. হতে বর্ণিত তিনি বলেন, রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম রমজানের শেষ দশকে এতেকাফ করতেন। (বুখারী শরীফ, হাদিস নং - ১৯৮০)

সুতরাং এই হাদিসগুলো দ্বারা প্রতীয়মান হয় যে, রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের জীবনের অন্যতম গুরুত্বপূর্ণ আমল, যা তিনি জীবনের শেষ রমজান পর্যন্ত গুরুত্ব সহকারে আদায় করেছেন। তাই আমাদের উচিত রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের এই গুরুত্বপূর্ণ আমলটি আঁকড়ে ধরা।

ইতিকাফের ফজিলত

ইতিকাফ মুমিনের জীবনে এক গুরুত্বপূর্ণ ও ফজিলতপূর্ণ ইবাদত। হাদিসে এর অনেক ফজিলত বর্ণিত হয়েছে । যেমন :

عن عبدالله بن عباس رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال في المعتكف هو يعكف الذنوب و يجري له من الحسنات كعامل الحسنات كلها.

'হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে আব্বাস রা. থেকে বর্ণিত, রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইতিকাফকারী সম্পর্কে বলেছেন, সে নিজেকে গুনাহ থেকে বিরত রাখে এবং নেককারদের সকল নেকী তার জন্য লেখা হয়। (সুনানে ইবনে মাজাহ, বাবুস সাওম)।

عن عبدالله بن عباس رض. عن النبي صلى الله عليه وسلم قال في المعتكف و من اعتكف يوما ابتعاء وجه الله تعالى جعل الله بينه وبين النار ثلاث خناديق أبعد ما بين الخافقين.

'হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে আব্বাস রা. থেকে বর্ণিত, তিনি রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম থেকে বর্ণনা করেন, যে ব্যক্তি আল্লাহর সন্তুষ্টির উদ্দেশ্যে একদিন ইতিকাফ

করবে আল্লাহ তাআলা তার ও জাহান্নামের মাঝে তিন খন্দক সমান দুরত্ব সৃষ্টি করবেন, যা আসমান জমিনের দুরত্ব অপেক্ষা বেশি। (তবারানী শরীফ)।

قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من اعتكف عشر في رمضان كان كحجتين و عمرتين.

'রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, যে ব্যক্তি রমজান মাসে দশ দিন ইতিকাফ করবে তার জন্য দুইটি হজ্জ ও দুইটি ওমরার সওয়াব লেখা হবে।' (বায়হাকী, হাদিস নং - ৩৬৮০)

উপরন্তু ইতিকাফকারী যদি রমজানের শেষ দশকের বিজোড় রাত্রগুলোতে ইবাদত করে তাহলে অবশ্যই সে লাইতুল কদরের ফজিলত লাভ করবে। আর কদর রাতের ফজিলত সম্পর্কে আল্লাহ তা'আলা বলেন -

لَيْلَةُ الْقَدْرِ خَيْرمِّنْ اَلْفِ شَهْرٍ.

'কদরের রাত্র হাজার মাস অপেক্ষা উত্তম।'
(সূরা ক্বদর - ০৩)

এছাড়াও ইতিকাফের মাধ্যমে ব্যক্তি সহজেই আল্লাহর নৈকট্য লাভ করতে পারে।

এতেকাফের ফজিলতঃ

এতেকাফ একটি মহান ইবাদত, মদিনায় অবস্থানকালীন সময়ে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম প্রতি বছরই এতেকাফ পালন করেছেন। দাওয়াত, তরবিয়ত, শিক্ষা এবং জিহাদে ব্যস্ত থাকা সত্ত্বেও রমজানে তিনি এতেকাফ ছাড়েননি। এতেকাফ ঈমানি তরবিয়তের একটি পাঠশালা, এবং রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের হিদায়েতি আলোর একটি প্রতীক। এতেকাফরত অবস্থায় বান্দা নিজেকে আল্লাহর ইবাদতের জন্য দুনিয়ার অন্যান্য সকল বিষয় থেকে আলাদা করে নেয়। ঐকান্তিকভাবে

মশগুল হয়ে পড়ে আল্লাহর নৈকট্য অর্জনের নিরন্তর সাধনায়। এতেকাফ ঈমান বৃদ্ধির একটি মূখ্য সুযোগ। সকলের উচিত এ সুযোগ কাজে লাগিয়ে নিজের ইমানি চেতনাকে প্রাণিত করে তোলা ও উন্নততর পর্যায়ে পৌছেঁ দেয়ার চেষ্টা করা।

আল-কুরআনুল কারিমে বিভিন্নভাবে এতেকাফ সম্পর্কে বর্ণনা এসেছে, ইবরাহিম আ. ও ইসমাইল আ. এর কথা উল্লেখ করে এরশাদ হয়েছে: "এবং আমি ইবরাহিম ও ইসমাইলকে আদেশ করলাম, তোমরা আমার গৃহকে তাওয়াফকারী, এতেকাফকারী ও রুকু-সেজদাকারীদের জন্য পবিত্র করো।" [সূরা বাকারা : ১২৫]।

এতেকাফ অবস্থায় স্ত্রীদের সাথে কি আচরণ হবে তা বলতে গিয়ে আল্লাহ তা-আলা বলেন: "আর তোমরা মসজিদে এতেকাফ কালে স্ত্রীদের সাথে মেলামেশা করো না।" [সূরা বাকারা : ১৮৭]।

ইবরাহিম আ. তাঁর পিতা এবং জাতিকে লক্ষ্য করে মূর্তির ভর্ৎসনা করতে যেয়ে যা বলেছিলেন, আল্লাহ তা-আলা তা উল্লেখ করে বলেন: "যখন তিনি তাঁর পিতা ও তাঁর সম্প্রদায়কে বললেন: "এই মূর্তিগুলো কি, যাদের পূজারি (এতেকাফকারী) হয়ে) তোমরা বসে আছ?" [সূরা আম্বিয়া : ৫২]।

রসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের অসংখ্য হাদিস এতেকাফ সম্পর্কে বর্ণিত হয়েছে, তার মধ্য হতে ফজিলত সম্পর্কিত কিছু হাদিস নিচে উল্লেখ করা হল।

আয়েশা রাদি-আল্লাহু আনহা থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন: রসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম রমজানের শেষের দশকে এতেকাফ করেছেন, ইন্তেকাল পর্যন্ত। এরপর তাঁর স্ত্রীগণ এতেকাফ করেছেন। [বুখারি ওমুসলিম]।

আয়েশা রাদি-আল্লাহু আনহা থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন: রসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম প্রত্যেক রমজানে এতেকাফ করতেন। [বুখারি ২০৪১]।

অন্য এক হাদিসে এসেছে: আমি (প্রথমে) এ রাতের সন্ধানে প্রথম দশে এতেকাফ পালন করি। অত:পর এতেকাফ পালন করি মাঝের দশে। পরবর্তীতে ওহির মাধ্যমে আমাকে জানানো হয় যে, এ রাত শেষ দশে রয়েছে। সুতরাং তোমাদের মাঝে যে (এ দশে) এতেকাফ পালনে আগ্রহী, সে যেন তা পালন করে। লোকেরা তার সাথে এতেকাফ পালন করল। রাসূল বলেন—আমাকে তা এক বেজোড় রাতে দেখানো হয়েছে এবং দেখানো হয়েছে যে, আমি সে ভোরে কাদা ও মাটিতে সেজদা দিচ্ছি। অত:পর রাসূল একুশের রাতের ভোর যাপন করলেন, ফজর পর্যন্ত তিনি কিয়ামুল্লাইল করেছিলেন। তিনি ফজর আদায়ের জন্য দণ্ডায়মান হয়েছিলেন। তখন আকাশ ছেপে বৃষ্টি নেমে এল, এবং মসজিদে চুঁইয়ে চুঁইয়ে পানি পড়ল। আমি কাদা ও পানি দেখতে পেলাম। ফজর সালাত শেষে যখন তিনি বের হলেন, তখন তার কপাল ও নাকের পাশে ছিল পানি ও কাদা। সেটি ছিল একুশের রাত।

আবু হুরাইরা রা. হতে বর্ণিত, তিনি বলেন: রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম প্রতি রমজানে দশ দিন এতেকাফ করতেন, তবে যে বছর তিনি পরলোকগত হন, সে বছর তিনি বিশ দিন এতেকাফে কাটান।

আবু হুরাইরা রা. হতে বর্ণিত হাদিসে উভয়টির উল্লেখ পাওয়া যায়। তিনি বলেন: আবু হুরাইরা রা. হতে বর্ণিত, তিনি বলেন : রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম প্রতি রমজানের শেষ দশদিন এতেকাফ করতেন। তবে যে বছর পরলোকগত হন তিনি বিশ দিন এতেকাফ করেছেন। [বুখারি]।

আয়শা রাদিয়াল্লাহু আনহা বলেন: রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সাথে তাঁর জনৈকা স্ত্রীও এতেকাফ করলেন। তখন তিনি ছিলেন এস্তেহাজা অবস্থায়, রক্ত দেখছেন। রক্তের কারণে হয়তো তাঁর নীচে গামলা রাখা হচ্ছে। [বুখারি]।

রাসূল (স:) বলেন: আমি কদরের রাত্রির সন্ধানে প্রথম দশ দিন এতেকাফ করলাম। এরপর এতেকাফ করলাম মধ্যবর্তী দশদিন। অত:পর ওহি প্রেরণ করে আমাকে জানানো হল যে তা শেষ দশদিনে। সুতরাং তোমাদের যে এতেকাফ পছন্দ করবে, সে যেন এতেকাফ করে। ফলে, মানুষ তার সাথে এতেকাফ যাপন করল।

এতেকাফের উপকারিতাঃ

১- এতেকাফকারী এক নামাজের পর আর এক নামাজের জন্য অপেক্ষা করে থাকে, আর এ অপেক্ষার অনেক ফজিলত রয়েছে। আবু হুরাইরা রাদি-আল্লাহু আনহু থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন: নিশ্চয় ফেরেশতারা তোমাদের একজনের জন্য দোয়া করতে থাকেন যতক্ষণ সে কথা না বলে, নামাজের স্থানে অবস্থান করে। তারা বলতে থাকে আল্লাহ তাকে ক্ষমা করে দিন, আল্লাহ তার প্রতি দয়া করুন, যতক্ষণ তোমাদের কেউ নামাজের স্থানে থাকবে, ও নামাজ তাকে আটকিয়ে রাখবে, তার পরিবারের নিকট যেতে নামাজ ছাড়া আর কিছু বিরত রাখবে না, ফেরেশতারা তার জন্য এভাবে দোয়া করতে থাকবে।

২- এতেকাফকারী কদরের রাতের তালাশে থাকে, যে রাত অনির্দিষ্টভাবে রমজানের যে কোন রাত হতে পারে। এই রহস্যের কারণে আল্লাহ তা-আলা সেটিকে বান্দাদের থেকে গোপন রেখেছেন, যেন তারা মাস জুড়ে তাকে তালাশ করতে থাকে।

৩- এতেকাফের ফলে আল্লাহ তা'আলার সাথে সম্পর্ক দৃঢ় হয়,এবং আল্লাহ তা'আলার জন্য মস্তক অবনত করার প্রকৃত চিত্র ফুটে উঠে। কেননা আল্লাহ তা'আলা বলেন: আমি মানুষ এবং জিন জাতিকে একমাত্র আমারই ইবাদতের জন্য সৃষ্টি করেছি। [সুরা আজ-জারিয়াত: ৫৬]।

আর এ ইবাদতের বিবিধ প্রতিফলন ঘটে এতেকাফ অবস্থায়। কেননা এতেকাফ অবস্থায় একজন মানুষ নিজেকে পুরোপুরি আল্লাহর ইবাদতের সীমানায় বেঁধে নেয়

এবং আল্লাহর সন্তুষ্টির কামনায় ব্যকুল হয়ে পড়ে। আল্লাহ তা-আলাও তাঁর বান্দাদেরকে নিরাশ করেন না, বরং তিনি বান্দাদেরকে নিরাশ হতে নিষেধ করে দিয়ে বলেছেন: হে আমার বান্দাগণ! যারা নিজেদের উপর জুলুম করেছ তোমরা আল্লাহর রহমত থেকে নিরাশ হয়ও না। নিশ্চয় আল্লাহ সমস্ত গুনাহ মাফ করে দেন। তিনি ক্ষমাশীল, পরম দয়ালু। [সুরা ঝুমার : ৫৩]।

আর আমার বান্দারা যখন তোমার কাছে জিজ্ঞেস করে আমার ব্যাপারে- বস্তুত আমি রয়েছি সন্নিকটে। প্রার্থনাকারীর প্রার্থনা কবুল করি যখন সে প্রার্থনা করে। কাজেই তারা যেন আমার হুকুম মান্য করে এবং আমার প্রতি বিশ্বাস স্থাপন করে। সম্ভবত তারা পথ প্রাপ্ত হবে। [আল-বাকারা : ১৮৬]।

৪– যখন কেউ মসজিদে অবস্থান করা পছন্দ করতে লাগে— যা সম্ভব প্রবৃত্তিকে অভ্যস্ত করানোর মাধ্যমে, কেননা প্রবৃত্তিকে যে বিষয়ে অভ্যস্ত করানো হবে সে বিষয়েই সে অভ্যস্ত হয়ে পড়বে— মসজিদে অবস্থান করা পছন্দ হতে শুরু করলে মসজিদকে সে ভালোবাসবে, সেখানে নামাজ আদায়কে ভালোবাসবে। আর এ প্রক্রিয়ায় আল্লাহর সাথে তার সম্পর্ক মজবুত হবে। হৃদয়ে সৃষ্টি হবে নামাজের ভালোবাসা, এবং নামাজ আদায়ের মাধ্যমেই অনুভব করতে শুরু করবে হৃদয়ের প্রশান্তি। যে প্রশান্তির কথা রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এভাবে বলেছিলেন: নামাজের মাধ্যমে আমাদেরকে শান্ত করো হে বেলাল, নামাজের মাধ্যমে আমাদেরকে শান্ত করো হে বেলাল।

৫– মসজিদে এতেকাফের মাধ্যমে একমাত্র আল্লাহ তা'আলার উদ্দেশে নিজেকে আবদ্ধ করে নেওয়ার কারণে মুসলমানের অন্তরের কঠোরতা দূরীভূত হয়, কেননা কঠোরতা সৃষ্টি হয় দুনিয়ার প্রতি ভালোবাসা ও পার্থিবতায় নিজেকে আরোপিত করে রাখার কারণে। মসজিদে নিজেকে আবদ্ধ করে রাখার কারণে দুনিয়ার প্রতি ভালোবাসায় ছেদ পড়ে এবং আত্মিক উন্নতির অভিজ্ঞতা অনুভূত হয়। মসজিদে এতেকাফ করার কারণে

ফেরেশতারা দোয়া করতে থাকে, ফলে এতেকাফকারী ব্যক্তির আত্মা নিম্নাবস্থার নাগপাশ কাটিয়ে ফেরেশতাদের স্তরের দিকে ধাবিত হয়। ফেরেশতাদের পর্যায় থেকেও বরং ঊর্ধ্বে ওঠার প্রয়াস পায়। কেননা ফেরেশতাদের প্রবৃত্তি নেই বিধায় প্রবৃত্তির ফাঁদে তারা পড়ে না। আর মানুষের প্রবৃত্তি থাকা সত্ত্বেও সব কিছু থেকে মুক্ত হয়ে আল্লাহর জন্য একাগ্রচিত্ত হয়ে যায়।

৬– এতেকাফের মাধ্যমে অন্তরে প্রশান্তি আসে।

৭– বেশি বেশি কুরআন তিলাওয়াতের সুযোগ সৃষ্টি হয়।

৮– ঐকান্তিকভাবে তওবা করার সুযোগ লাভ হয়।

৯– তাহাজ্জুদে অভ্যস্ত হওয়া যায়।

১০– সময়কে সুন্দরভাবে কাজে লাগানো যায়।

এতেকাফের আহকামঃ

ইসলামি শরিয়াতে এতেকাফের অবস্থান: এতেকাফ করা সুন্নাত। এতেকাফের সবচেয়ে উপযোগী সময় রমজানের শেষ দশক, এতেকাফ কুরআন, হাদিস ও এজমা দ্বারা প্রমাণিত। ইমাম আহমদ রহ. বলেন: কোন মুসলমান এতেকাফকে সুন্নাত বলে স্বীকার করেনি এমনটি আমার জানা নেই।

এতেকাফের উদ্দেশ্যঃ

এতেকাফের উদ্দেশ্য হ’ল আল্লাহ তা‘আলার সন্তুষ্টি অর্জন করা। নিজের গোনাহ মাফ করে নেওয়ার সবচেয়ে বড় মাধ্যম হ’ল এতেকাফ। তাবেঈ মাসরূক (রহঃ) বলেন, ব্যক্তির জন্য করণীয় হ’ল সে এমন কোন স্থানে একাকী হবে, যেখানে সে নিজের গোনাহ স্মরণ করে তা হ’তে ক্ষমা প্রার্থনা করবে।এক্ষেত্রে এতেকাফ এক উত্তম মাধ্যম। আর এর মাধ্যমে ‘লাইলাতুল ক্বদরকে’ অন্বেষণ করা যায়।

১- আল্লাহর সাথে সম্পর্ক দৃঢ় করাঃ

আল্লাহর দিকে আকৃষ্ট হওয়া ও আল্লাহ কেন্দ্রিক ব্যতিব্যস্ততা যখন অন্তর সংশোধিত ও ঈমানি দৃঢ়তা অর্জনের পথ, কেয়ামতের দিন তার মুক্তিও বরং এ পথেই, তাহলে এতেকাফ হল এমন একটি ইবাদত যার মাধ্যমে বান্দা সমস্ত সৃষ্টি-জীব থেকে আলাদা হয়ে যথাসম্ভব প্রভুর সান্নিধ্যে চলে আসে। বান্দার কাজ হল তাঁকে স্মরণ করা, তাঁকে ভালোবাসা ও তাঁর ইবাদত করা। সর্বদা তার সন্তুষ্টি ও নৈকট্য লাভের চেষ্টা করা, এরই মাধ্যমে আল্লাহর সাথে বান্দার সম্পর্ক দৃঢ় ও মজবুত হয়।

২- পাশবিক প্রবণতা এবং অহেতুক কাজ থেকে দুরে থাকাঃ

রোজার মাধ্যমে আল্লাহ তা-আলা তাঁর বান্দাদেরকে বাঁচিয়ে রাখেন অতিরিক্ত পানাহার ও যৌনাচারসহ পশু প্রবৃত্তির বিবিধ প্রয়োগ থেকে, অনুরূপভাবে তিনি এতেকাফের বিধানের মাধ্যমে তাদেরকে বাঁচিয়ে রাখেন অহেতুক কথা-বার্তা, মন্দ সংস্পর্শ, ও অধিক ঘুম হতে ।এতেকাফের মাধ্যমে একজন ব্যক্তি সম্পূর্ণ অর্থে আল্লাহর জন্য নিবেদিত হয়ে যায়। নামাজ, কুরআন তিলাওয়াত, জিকির ও দোয়া ইত্যাদির নির্বাধ চর্চার মাধ্যমে আল্লাহর নৈকট্য লাভের অফুরান সুযোগের আবহে সে নিজেকে পেয়ে যায়।

৩- শবে কদর তালাশ করাঃ

এতেকাফের মাধ্যমে শবে কদর খোঁজ করা রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের মূল উদ্দেশ্য ছিল, আবু সায়ীদ খুদরি রা. থেকে বর্ণিত হাদিস সে কথারই প্রমাণ বহন করে, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন: আমি প্রথম দশকে এতেকাফ করেছি এই (কদর) রজনী খোঁজ করার উদ্দেশে, অতঃপর এতেকাফ করেছি মাঝের দশকে, অত:পর মাঝ-দশক পেরিয়ে এলাম , তারপর আমাকে বলা হল, (কদর) তো শেষ দশকে। তোমাদের মধ্যে যদি কেউ এতেকাফ করতে চায় সে

যেন এতেকাফ করে, অত:পর লোকেরা তাঁর সাথে এতেকাফ করল। [মুসলিম: হাদিস নং ১১৬৭]

৪-মসজিদে অবস্থানের অভ্যাস গড়ে তোলাঃ

এতেকাফের মাধ্যমে বান্দার অন্তর মসজিদের সাথে জুড়ে যায়, মসজিদের সাথে সম্পৃক্ত হওয়ার অভ্যাস গড়ে উঠে। হাদিস অনুযায়ী যে সাত ব্যক্তিকে আল্লাহ তা-আলা তাঁর নিজের ছায়ার নীচে ছায়া দান করবেন তাদের মধ্যে একজন হলেন ওই ব্যক্তি মসজিদের সাথে যার হৃদয় ছিল বাঁধা।

৫- দুনিয়া ত্যাগ ও বিলাসিতা থেকে দুরে থাকাঃ

এতেকাফকারী যেসব বিষয়ের স্পৃক্ততায় জীবন যাপন করত সেসব থেকে সরে এসে নিজেকে মসজিদে আবদ্ধ করে ফেলে। এতেকাফ অবস্থায় দুনিয়া ও দুনিয়ার স্বাদ থেকে সে বিচ্ছিন্ন হয়ে পড়ে, ঠিক ঐ আরোহীর ন্যায় যে কোন গাছের ছায়ার নীচে বসল, অতঃপর সেখান থেকে উঠে চলে গেল।

৬- ইচ্ছাশক্তি প্রবল করা এবং প্রবৃত্তিকে খারাপ অভ্যাস ও কামনা-বাসনা থেকে বিরত রাখার অভ্যাস গড়ে তোলাঃ

কেননা এতেকাফ দ্বারা খারাপ অভ্যাস থেকে বিরত থাকার ট্রেন্ড গড়ে উঠে। এতেকাফ তার জন্য সুবর্ণ সুযোগ সৃষ্টি করে দেয় নিজেকে ধৈর্যের গুণে গুণান্বিত করতে ও নিজের ইচ্ছাশক্তিকে শানিত করতে। এতেকাফ থেকে একজন মানুষ সম্পূর্ণ নতুন মানুষ হয়ে বের হয়ে আসার সুযোগ পায়। যা পরকালে উপকারে আসবেনা তা থেকে বিরত থাকার ফুরসত মেলে।

এতেকাফের বিধানাবলিঃ

১- এতেকাফের সময়-সীমাঃ

সবচেয়ে কম সময়ের এতেকাফ হল, শুদ্ধ মত অনুযায়ী, একদিন একরাত। কেননা সাহাবায়ে কেরাম (রাদি-আল্লাহু আনহুম) নামাজ অথবা উপদেশ শ্রবণ করার অপেক্ষায় বা জ্ঞান অর্জন ইত্যাদির জন্য মসজিদে বসতেন, তবে তারা এ সবের জন্য এতেকাফের নিয়ত করেছেন বলে শোনা যায়নি।সর্বোচ্চ কতদিনের জন্য এতেকাফ করা যায় এ ব্যাপারে ওলামাদের মতামত হল, এ ব্যাপারে নির্ধারিত কোন সীমা-রেখা নেই।

২- এতেকাফে প্রবেশ ও বাহির হওয়ার সময়ঃ

এতেকাফকারী যদি রমজানের শেষ দশকে এতেকাফের নিয়ত করে তা হলে একুশতম রাত্রির সূর্য অস্ত যাওয়ার পূর্বে মসজিদে প্রবেশ করবে, কেননা তার উদ্দেশ্য কদরের রাত তালাশ করা, যা আশা করা হয়ে থাকে বেজোড় রাত্রগুলোতে, যার মধ্যে একুশের রাতও রয়েছে।তবে এতেকাফ থেকে বের হওয়ার ক্ষেত্রে উত্তম হল চাঁদ রাত্রি মসজিদে অবস্থান করে পরদিন সকালে সরাসরি ইদগাহে চলে যাওয়া। তবে চাঁদ রাতে সূর্যাস্তের পর মসজিদ থেকে বের হয়ে গেলেও কোন সমস্যা নেই, বৈধ রয়েছে।

৩- এতেকাফের শর্তাবলিঃ

এতেকাফের অনেকগুলো শর্ত রয়েছে । শর্ত গুলো নিুরূপ: এতেকাফের জন্য কেউ কেউ রোজার শর্ত করেছেন, কিন্তু বিশুদ্ধ মত হল রোজা শর্ত নয়। কেননা রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম থেকে প্রমাণিত আছে যে তিনি কোন এক বছর শাওয়ালের প্রথম দশকে এতেকাফ করেছিলেন, আর এ দশকে ঈদের দিনও আছে। আর ঈদের দিনে তো রোজা রাখা নিষিদ্ধ।

- এতেকাফের জন্য মুসলমান হওয়া শর্ত। কেননা কাফেরের ইবাদত গ্রহণযোগ্য হয় না।
- এতেকাফকারীকে বোধশক্তিসম্পন্ন হতে হবে, কেননা নির্বোধ ব্যক্তির কাজের কোনো উদ্দেশ্য থাকে না, আর উদ্দেশ্য ব্যতীত কাজ শুদ্ধ হতে পারে না।
- ভালো-মন্দ পার্থক্য করার জ্ঞান থাকতে হবে, কেননা কম বয়সী, যে ভাল মন্দের পার্থক্য করতে পারে না, তার নিয়তও শুদ্ধ হয় না।
- এতেকাফের নিয়ত করতে হবে, কেননা মসজিদে অবস্থান হয়তো এতেকাফের নিয়তে হবে অথবা অন্য কোনো নিয়তে। আর এ দুটোর মধ্যে পার্থক্য করার জন্য নিয়তের প্রয়োজন।
- উপরুন্তু রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন:প্রত্যেক কাজের নির্ভরতা নিয়তের উপর, যে যা নিয়ত করবে সে কেবল তাই পাবে। [বুখারি : ১]
- এতেকাফ অবস্থায় মহিলাদের হায়েজ-নিফাস থেকে পবিত্র থাকা জরুরি, কেননা এ অবস্থায় মসজিদে অবস্থান করা হারাম, অবশ্য এস্তেহাজা অবস্থায় এতেকাফ করা বৈধ। আয়েশা রা. আনহা বলেন : রসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের সাথে তাঁর স্ত্রী-গণের মধ্য হতে কেউ একজন এতেকাফ করেছিলেন এস্তেহাজা অবস্থায়। তিনি লাল ও হলুদ রঙ্গের স্রাব দেখতে পাচ্ছিলেন, আমরা কখনো তার নীচে পাত্র রেখে দিয়েছি নামাজের সময়। [বুখারি ২০৩৭]।
- এস্তেহাজাগ্রস্তদের সাথে অন্যান্য বেধীগ্রস্তদেরকে মেলানো যায় , যেমন যার বহুমূত্র রোগ বিশিষ্ট ব্যক্তি আছে, তবে শর্ত হল মসজিদ যেন অপবিত্র না হয়।
- গোসল ফরজ হয় এমন ধরনের অপবিত্রতা থেকে পবিত্র হতে হবে। অপবিত্র লোক মসজিদে অবস্থান করা হারাম। যদিও কোন কোন আলেম ওজু করার

শর্তে মসজিদে অবস্থান বৈধ বলেছেন। আর যদি অপবিত্রতা, যৌন স্পর্শ অথবা স্বামী -স্ত্রীর মিলনের ফলে হয়, তবে সকলের মতে এতেকাফ ভঙ্গ হয়ে যাবে। আর যদি স্বপ্নদোষের কারণে হয়, তা হলে কারোর মতে এতেকাফ ভঙ্গ হবে না। আর যদি হস্তমৈথুনের কারণে হয় তা হলে সঠিক মত অনুসারে এতেকাফ ভঙ্গ হয়ে যাবে।

- এতেকাফ মসজিদে হতে হবে এ ব্যাপারে সকল আলেম একমত যে এতেকাফ মসজিদে হতে হবে, তবে জামে মসজিদ হলে উত্তম কেননা এমতাবস্থায় জুমার নামাজের জন্য এতেকাফকারীকে মসজিদ থেকে বের হতে হবে না।

মসজিদ থেকে বের হওয়ার বিধানঃ

- এতেকাফকারী যদি বিনা প্রয়োজনে মসজিদ থেকে বের হয় তাহলে তার এতেকাফ ভঙ্গ হয়ে যাবে।
- আর এতেকাফের স্থান থেকে যদি মানবীয় প্রয়োজন মিটানোর জন্য বের হয় তাহলে এতেকাফ ভঙ্গ হবে না।
- মসজিদে থেকে পবিত্রতা অর্জন সম্ভব না হলে মসজিদ থেকে বের হওয়ার অনুমতি আছে।
- বাহক না থাকার কারণে এতেকাফকারীকে যদি পানাহারের প্রয়োজনে বাইরে যেতে হয় অথবা মসজিদে খাবার গ্রহণ করতে লজ্জা বোধ হয় , তবে এরূপ প্রয়োজনে বাইরে যাওয়ার অনুমতি আছে।
- যে মসজিদে এতেকাফে বসেছে সেখানে জুমার নামাজের ব্যবস্থা না থাকলে জুমার নামাজ আদায়ের প্রয়োজনে মসজিদ থেকে বের হওয়া ওয়াজিব, এবং আগে ভাগেই রওয়ানা হওয়া তার জন্য মুস্তাহাব ।
- ওজরের কারণে এতেকাফকারী মসজিদ থেকে বের হতে পারে। ছাফিয়্যা রা. থেকে বর্ণিত হাদিস এর প্রমাণ ছাফিয়্যা রা. আনহা রমজানের শেষ দশকে

এতেকাফস্থলে রসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সাথে সাক্ষাৎ করতে এলেন। রসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সাথে কতক্ষণ কথা বললেন, অতঃপর যাওয়ার জন্য উঠে দাঁড়ালেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামও তাকে বিদায় দিতে উঠে দাঁড়ালেন।[বুখারি : ২০৩৫]।

- কোন নেকির কাজ করার জন্য এতেকাফকারীর মসজিদ থেকে বের হওয়া বৈধ নয়। যেমন রোগী দেখতে যাওয়া, জানাজায় উপস্থিত হওয়া ইত্যাদি। এ মর্মে আয়শা রা. আনহা বলেন: এতেকাফকারীর জন্য সুন্নত হল, সে রোগী দেখতে যাবে না, জানাযায় উপস্থিত হবে না, স্ত্রীকে স্পর্শ করবে না ও তার সাথে কামাচার থেকে বিরত থাকবে এবং অতি প্রয়োজন ব্যতীত মসজিদ থেকে বের হবে না। [আবু দাউদ, হাদিস নং ২৪৭৩]।
- এতেকাফ-বিরুদ্ধ কোন কাজের জন্য এতেকাফকারীর মসজিদ থেকে বের হওয়া বৈধ নয়, যেমন ক্রয়-বিক্রয়, স্বামী-স্ত্রীর মিলন ইত্যাদি।

এতেকাফকারীর জন্য যা কিছু বিধিবদ্ধঃ

- ইবাদত আদায়, যেমন নামাজ, কুরআন তিলাওয়াত, জিকির ও দোয়া ইত্যাদি। কেননা এতেকাফের উদ্দেশ্য হল আল্লাহ তা'আলার সমীপে অন্তরের একাগ্রতা নিবেদন করা এবং তাঁর প্রতি আকৃষ্ট হওয়া যা উপরোক্ত ইবাদত আদায় ছাড়া সম্ভব নয়।অনুরূপভাবে যেসব ইবাদতের প্রভাব অন্যদের পর্যন্ত পৌঁছায় যেমন সালামের উত্তর দেওয়া, সৎ কাজের আদেশ ও অসৎ কাজ থেকে বারণ, প্রশ্নের উত্তর দেওয়া, পথ দেখানো, ইলম শিক্ষা দেওয়া কুরআন পড়ানো ইত্যাদিও করতে পারবে। কিন্তু শর্ত হল এগুলো যেন এত বেশি না হয় যে এতেকাফের মূল উদ্দেশই ছুটে যায়।
- এতেকাফকারীর জন্য মুস্তাহাব হল তার এতেকাফের স্থানে কোন কিছু দ্বারা পর্দা করে নেয়া। কেননা রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম তুর্কি গম্বুজের ভিতরে এতেকাফ করেছেন যার দরজায় ছিল চাটাই।

- এতেকাফকারী তার প্রয়োজনীয় জিনিস-পত্র সঙ্গে নেবেযাতে নিজের প্রয়োজনে তাকে বার বার মসজিদের বাইরে যেতে না হয়; আবু সাইদ খুদরি রাদি আল্লাহু আনহুর হাদিসে এসেছে , তিনি বলেন: আমরা রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের সাথে রমজানের মাঝের দশকে এতেকাফ করলাম, যখন বিশ তারিখ সকাল হল আমরা আমাদের বিছানা-পত্র সরিয়ে নিলাম, তখন রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এসে বললেন: যে এতেকাফ করেছে সে তার এতেকাফের স্থানে ফিরে যাবে । [বুখারি : ২০৪০]।

এতেকাফকারীর জন্য যা অনুমোদিতঃ

- এতেকাফকারীর জন্য মসজিদে পানাহার ও ঘুমানোর অনুমতি আছে। এ ব্যাপারে সকল ইমামদের ঐক্যমত রয়েছে। তবে এ ব্যাপারে সতর্ক হওয়া উচিত; কেননা আল্লাহর প্রতি একাগ্রচিত্ত এবং একনিষ্ঠভাবে মনোনিবেশের জন্য কম খাওয়া কম ঘুমানো সহায়ক বলে বিবেচিত।
- গোসল করা, চুল আঁচড়ানো, তেল ও সুগন্ধি ব্যবহার, ভাল পোশাক পরা, এ সবের অনুমতি আছে। আয়েশা রা. আনহার হাদিসে এসেছে: তিনি মাসিক অবস্থায় নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের মাথার কেশ বিন্যাস করে দিতেন, যখন রসুল মসজিদে এতেকাফরত অবস্থায় থাকতেন, আয়েশা রা. তার কক্ষে থাকা অবস্থায় রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের মাথার নাগাল পেতেন। [বুখারি : ২০৪৬]।
- এতেকাফকারীর পরিবার তার সাথে সাক্ষাৎ করতে পারবে, কথা বলতে পারবে, কেননা নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের স্ত্রীগণ এতেকাফকালীন তার সাথে সাক্ষাৎ করতেন। কিন্তু সাক্ষাৎ দীর্ঘ না হওয়া বাঞ্ছনীয়।

এতেকাফকারী যা থেকে বিরত থাকবেঃ

- ওজর ছাড়া এতেকাফকারী এমন কোন কাজ করবে না যা এতেকাফকে ভঙ্গ করে দেয়, আল্লাহ তা-আলা বলেন: তোমরা তোমাদের কাজসমুহকে নষ্ট করো না।
- ঐ সকল কাজ যা এতেকাফের উদ্দেশ্যকে ব্যাহত করে, যেমন বেশি কথা বলা, বেশি মেলামেশা করা, অধিক ঘুমানো, ইবাদতের সময়কে কাজে না লাগানো ইত্যাদি।
- এতেকাফকারী মসজিদে অবস্থানকালে ক্রয়-বিক্রয় করবে না, কেননা নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম মসজিদে ক্রয়-বিক্রয় করতে নিষেধ করেছেন। [মুসনাদে আহমদ : ৬৯৯১]।

এমনিভাবে যা ক্রয় বিক্রয়ের কাজ বলে বিবেচিত যেমন বিভিন্ন ধরনের চুক্তিপত্র, ভাড়া, মুদারাবা, মুশারাকা, বন্দক রাখা ইত্যাদি। কিন্তু যদি মসজিদের বাহিরে এমন ক্রয়-বিক্রয় হয় যা ছাড়া এতেকাফকারীর সংসার চলে না তবে তা বৈধ বলে বিবেচিত হবে।

মসজিদে বায়ু ত্যাগ করা থেকে বিরত থাকতে হবে। আনাস রা. আনহুর হাদিসে এসেছে, যখন বেদুইন লোকটি মসজিদে প্রস্রাব করেছিল তখন রাসূল বলেছিলেন: মসজিদ প্রস্রাব, ময়লা-আবর্জনার উপযোগী নয়, বরং মসজিদ অবশ্যই আল্লাহর জিকির এবং নামাজ ও কুরআন তিলাওয়াতের জন্য। [মুসলিম : ২৮৫]।

এতেকাফ অবস্থায় যৌন স্পর্শ নিষেধ, এ ব্যাপারে সকল ওলামাদের ঐকমত্য রয়েছে। তবে অধিকাংশ ওলামাদের মতে বীর্যস্খলনের দ্বারাই কেবল এতেকাফ ভঙ্গ হয়।

রোজার ভূমিকা, তাৎপর্য ও ইতিহাসঃ

রাসূল (সা.) বলেন, রোজাদারের জন্য দুইটি আনন্দময় মুহূর্ত রয়েছে ১. ইফতারের সময় ২. আখিরাতে আল্লাহর সঙ্গে সাক্ষাতের সময়'। (বুখারী ও মুসলিম)।

ইসলাম ধর্মের পাঁচটি মূল ভিত্তির তৃতীয়টি হলো রোজা। ইসলামি বিধান অনুসারে মুসলিম, প্রাপ্তবয়স্ক,সুস্থ মস্তিষ্কসম্পন্ন,স্থায়ী ও শারীরিক মানসিকভাবে সামর্থ্যবান প্রত্যেক মুসলিমের জন্য সিয়াম পালন বা রোজা রাখা ফরজ।

রোজা শব্দের অর্থ হচ্ছে 'বিরত থাকা'। আর আরবিতে এর নাম সাওম, বহুবচনে সিয়াম। যার শাব্দিক অর্থ হচ্ছে কোনো কাজ থেকে বিরত থাকা। সুবহে সাদিক থেকে সূর্যাস্ত পর্যন্ত সর্ব প্রকার পানাহার, কামাচার, পাপাচার এবং সেই সঙ্গে যাবতীয় ভোগ-বিলাস ও অপ্রয়োজনীয় কাজ থেকে বিরত থাকার নাম রোজা।

রোজা শব্দটি ফার্সি ভাষা থেকে এসেছে। এর আরবি শব্দগুলো হল সাওম বা সিয়াম।

যার অর্থ হলো কোন কাজ থেকে বিরত থাকা। রোজা থাকা মানে শুধু না খেয়ে থাকা নয়। রোজা হলো নিয়তের সঙ্গে সুবহে সাদিক থেকে সূর্যাস্ত পর্যন্ত পানাহার ও স্ত্রী সহবাস থেকে বিরত থাকা। যুগে যুগে বিভিন্ন নবি-রাসূলদের জামানায় এ রোজা ফরজ ছিল।

মহান রাব্বুল আলামিন আমাদের আদি পিতা হযরত আদম (আ.) এর ওপর রোজার বিধান আরোপ করে মানব ইতিহাসে সর্বপ্রথম রোজার প্রচলন শুরু করেন। আমাদের পূর্ববর্তী সকল নবী ও উম্মতের উপরও রোজার বিধান আরোপ করা হয়েছিল।

উম্মতে মুহাম্মাদির ওপর এরই ধারাবাহিকতায় রোজা ফরজ করা হয়েছে। পবিত্র কুরআনে আল্লাহতায়ালা বলেন, 'হে ইমানদারগণ, তোমাদের ওপর রোজা ফরজ করা হয়েছে, যেমন রোজা ফরজ করা হয়েছিল তোমাদের পূর্ববর্তীদের ওপর। যাতে তোমরা তাকওয়া অর্জন করতে পারো।' (সূরা আল বাকারা, আয়াত: ১৮৩)।

হজরত আদম আলাইহিস সালাম সম্পর্কে বলা হয়েছে, তিনি জান্নাত থেকে পৃথিবীতে আগমন করার পরে প্রত্যেক মাসে তিনটি রোজা রাখতেন। এটা শুকরিয়া হিসেবেও হতে পারে। আবার তাওবা হিসেবেও হতে পারে। চাঁদের হিসেবে ১৩, ১৪ ও ১৫ তারিখে এই রোজা রাখতেন। কারণ, এই দিনগুলোতে চাঁদ পূর্ণতা পায়।

বলা হয়, একবার তিনি পানিতে নিজের চেহারা দেখে বুঝতে পারেন যে জান্নাতের সৌন্দর্য ও লাবণ্য তিনি এখানে পাননি। তখন তিনি দুঃখিত হয়ে বলেন, হে আল্লাহ, জান্নাতের পোশাকও আমার থেকে ছিনিয়ে নেওয়া হয়েছে। আবার সৌন্দর্য ও লাবণ্যও দেওয়া হয়নি। তখন তাকে বলা হয়, তুমি মাসে তিনটি রোজা রাখো। তিনি এই রোজা রাখতে শুরু করেন, যার বদৌলতে আগের মতো জান্নাতি রূপ-লাবণ্য ও ঔজ্জ্বল্য ফিরে পান। অবশ্য আলোচ্য বক্তব্যের কোনও সূত্র খুঁজে পাওয়া যায় না।

যেভাবেই হোক, হজরত আদম আলাইহিস সালাম থেকে রোজার ধারাবাহিকতা শুরু হয়।

তার পরবর্তী যুগে হজরত নূহ আলাইহিস সালাম এই রোজা রাখতেন। হজরত ইবরাহিম আলাইহিস সালামও রোজা রাখতেন। এ ব্যাপারে হাদিসে নববিতেও গুরুত্বপূর্ণ নির্দেশনা পাওয়া যায়। হজরত মুসা আলাইহিস সালাম যখন তুর পাহাড়ে আল্লাহ তাআলার সাথে কথোপকথনে গমন করেন, তখন তিনি ৪০ দিন রোজা রাখেন। হজরত দাউদ আলাইহিস সালামকে আল্লাহ তাআলা দুনিয়ার রাজত্বও দিয়েছিলেন।

আবার নবুয়তও দিয়েছিলেন। তিনি একদিন রোজা রাখতেন, একদিন ইফতার করতেন। বছরে ছয় মাস রোজা রাখতেন। হাদিসে নববিতে একে রোজা রাখার উত্তম পদ্ধতি বলা হয়েছে। হজরত আবদুল্লাহ ইবনে আমর রাদিয়াল্লাহু আনহু বলেন, প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আমাকে বলেছেন :

আল্লাহর নিকট সবচেয়ে পছন্দনীয় রোজা হলো হজরত দাউদ আলাইহিস সালামের নিয়মে রোজা পালন করা। তিনি একদিন সওম পালন করতেন, আরেক দিন বিরত থাকতেন। [সহিহ বুখারি, হাদিস : ১১৩১]

হজরত জাকারিয়া ও ইয়াহইয়া আলাইহিমাস সালামও রোজা রেখেছেন। হজরত ঈসা আলাইহিস সালামও দুই মাসের রোজা রাখতেন। হিন্দু ব্রাহ্মণরাও ৪০টি রোজা রাখেন। অতএব, বোঝা গেলো প্রত্যেক ধর্মে Fasting (রোজা) ইবাদত রয়েছে। ইনসাইক্লোপিডিয়া অব ব্রিটানিকায় Fasting (রোজা) শিরোনামের অধীনে লেখা হয়েছে, 'আমরা দুনিয়ার এমন কোনও ধর্ম পাইনি, যে ধর্মে রোজার ইবাদত নেই।'

আশুরার রোজা: হিজরত করে মদিনায় আসার কিছু দিন পর থেকেই মুসলিমরা আশুরার রোজা পালন করতে শুরু করেন। এই সময় আশুরার রোজাই তাদের ওপর ওয়াজিব ছিল। হজরত আবদুল্লাহ ইবনে আব্বাস রাদিয়াল্লাহু আনহু বলেন, প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম যখন মদিনায় আসেন তখন দেখতে পান, ইহুদিরা আশুরার দিন রোজা রাখে। তাদের রোজা রাখার কারণ জিজ্ঞাসা করলে তারা বললো, এই দিনেই আল্লাহ তাআলা মুসা ও বনি ইসরাইলকে ফিরাউনের ওপর বিজয় দিয়েছিলেন। তাই আমরা ওই দিনের সম্মানে রোজা পালন করি।

প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন, তোমাদের চেয়ে আমরা মুসা আলাইহিস সালামের বেশি নিকটবর্তী। এরপর তিনি সবাইকে রোজা পালনের নির্দেশ দেন। [সহিহ বুখারি, হাদিস : ৩৯৪৩]

হজরত আয়েশা রাদিয়াল্লাহু আনহা বলেন : জাহেলি যুগে কুরাইশরা আশুরার রোজা পালন করতো এবং প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামও এই রোজা পালন করতেন। যখন তিনি মদিনায় আগমন করেন তখনও এই রোজা পালন করেন এবং তা পালনের নির্দেশ দেন। যখন রমজানের রোজা ফরজ করা হলো তখন আশুরার রোজা ছেড়ে দেওয়া হয়। যার ইচ্ছা সে পালন করবে আর যার ইচ্ছা পালন করবে না। [সহিহ বুখারি, হাদিস : ২০০২]

বেশিরভাগ ফকিহ ও মুহাদ্দিসের মতে, রমজানের রোজা ফরজ হওয়ার আগে আশুরার রোজা ওয়াজিব ছিল, যা পরবর্তী সময়ে নফলে পরিণত হয়। আর প্রতি মাসে তিন দিন রোজা রাখার বিধান সবসময় মুস্তাহাব ছিল।

রমজানের রোজা: দ্বিতীয় হিজরিতে রমজানের রোজা ফরজ হয়। এই হিসাবে প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম মোট ৯ বছর রমজানের রোজা পালন করেছেন। [আল-মাজমুআ: ৬/২৫০]।

প্রথমে ইচ্ছাধিকার ছিল: রমজানের রোজা যখন প্রথম ফরজ হয়, তখন রোজা রাখা ও ফিদিয়া দেওয়ার ইচ্ছাধিকার দেওয়া হয়।

এরশাদ হচ্ছে:

(তোমাদের ফরজ করা হয়েছে) রোজা নির্দিষ্ট কয়েক দিনের। তোমাদের মধ্যে কেউ পীড়িত হলে বা সফরে থাকলে অন্য সময় এই সংখ্যা পূরণ করে নিতে হবে। এটা যাদের মারাত্মক কষ্ট দেয় তাদের কর্তব্য হলো, এর পরিবর্তে ফিদিয়া—একজন অভাবগ্রস্তকে খাদ্য দান করা। যদি কেউ স্বতঃস্ফূর্তভাবে সৎকাজ করে তবে তা তার পক্ষে অধিক কল্যাণকর। অবশ্য রোজা পালন করাই তোমাদের জন্য অধিকতর কল্যাণকর, যদি তোমরা জানতে। [সুরা বাকারা, আয়াত: ১৮৪]

ফরজ বিধান : এরপর কোনও প্রকার অবকাশ না রেখেই রোজা ফরজ করা হয়।

এরশাদ হচ্ছে :

রমজান মাস। এতে মানুষের দিশারী এবং সৎপথের স্পষ্ট নিদর্শন ও সত্যাসত্যের পার্থক্যকারীরূপে কোরআন অবতীর্ণ হয়েছে। সুতরাং তোমাদের মধ্যে যারা এই মাস পাবে তারা যেন এই মাসে রোজা পালন করে। তোমাদের মধ্যে কেউ পীড়িত হলে বা সফরে থাকলে অন্য সময় এই সংখ্যা পূরণ করে নিতে হবে। [সুরা বাকারা, আয়াত : ১৮৫]।

সময় রদবদল : রমজানের রোজা যখন ফরজ হয়, তখন কেবল রাতের বেলা এশার নামাজ বা ঘুমের আগ পর্যন্ত পানাহার ও স্ত্রী-সহবাসের সুযোগ ছিল। এশার নামাজ বা ঘুমের পর পানাহার ও স্ত্রী-সহবাস নিষিদ্ধ হয়ে যেতো। পরবর্তীতে আল্লাহ তাআলা সময় সংক্ষিপ্ত করে সুবহে সাদিক থেকে সূর্যাস্ত পর্যন্ত রোজার সময় নির্ধারণ করেন।

এরশাদ হচ্ছে :

রোজার রাতে তোমাদের জন্য স্ত্রী-সহবাস বৈধ করা হয়েছে। তারা তোমাদের পরিচ্ছদ এবং তোমরা তাদের পরিচ্ছদ। আল্লাহ জানেন যে তোমরা নিজেদের প্রতি অবিচার করছিলে। অতঃপর তিনি তোমাদের প্রতি ক্ষমাশীল হয়েছেন এবং তোমাদের অপরাধ ক্ষমা করেছেন। সুতরাং এখন তোমরা তাদের সঙ্গে সংগত হও এবং আল্লাহ যা তোমাদের জন্য বিধিবদ্ধ করেছেন তা কামনা করো। আর তোমরা পানাহার করো যতক্ষণ রাতের কৃষ্ণরেখা থেকে ঊষার শুভ্ররেখা স্পষ্টরূপে তোমাদের কাছে প্রতিভাত না হয়। [সুরা বাকারা, আয়াত : ১৮৭]।

এভাবেই ধারাবাহিকভাবে রোজা ফরজ হয়। আল্লাহ তাআলা আমাদের সঠিকভাবে রোজা রাখার তাওফিক দান করুন। আমীন।